পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ

আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক আলোচনায় যে বিষয়টিকে কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তা হল আদিবাসী আন্দোলন বা বিদ্রোহ। আদিবাসী আন্দোলনের সূত্রেই অনাদিবাসী সমাজে, মননে, ভাবনায় প্রথম আদিবাসী অস্তিত্বের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। হয়তো এই প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা প্রাথমিকভাবে বা সাময়িকভাবে নেতিবাচক, তবুও অধিকারের পক্ষে ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের দৃপ্ত প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত মানুষের অধিকারের সপক্ষে থাকা মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকদের কলম ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষের লড়াইকে মুক্ত করে তাকে অন্যমাত্রা প্রদান করেছে। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর সময় পর্যন্ত সংঘটিত আদিবাসী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যাবে ভারতের আদিবাসী আন্দোলনের প্রকৃতি মূলত সংস্কারমূলক, কৃষি-অরণ্যের অধিকারকেন্দ্রিক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকেন্দ্রিক। সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক। প্রাক্-ব্রিটিশ সময়কালে ভূমির ব্যবহার ছিল কৃষকের হাতে এবং কর্তৃত্ব ছিল শাসকের। খাজনা বা কর নিয়ে বিরোধ লেগে ছিল কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনে। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সূত্র ধরে জন্ম হয় নব্য জমিদার, জোতদার, মহাজনদের। আদিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তাদের সহযোগী নব্য জমিদার, সুদখোর মহাজন ও দিকু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। এই আদিবাসী বিদ্রোহগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৯-১৭৯৯), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০), বাস্তার বিদ্রোহ (১৯১০), ভীল বিদ্রোহ (১৯২১-২২), নাগা বিদ্রোহ (১৯৩০-৩২), রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪৩) প্রভৃতি। জমির অধিকার, অরণ্যের অধিকার এবং ইংরেজ ও অপরাপর ইংরেজ সহযোগী শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল এই সমস্ত

আন্দোলন। স্বাধীনতা-প্রাক্কালে তেভাগা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনে বামপন্থী নেতৃত্বে অংশ নিয়েছিল প্রচুর আদিবাসীরাও। শ্রীকাকুলামের গিরিজন বিদ্রোহ প্রথম ঘটে ১৯০০ সালে, ব্রিটিশ যুগে। শ্রীকাকুলামের পার্বত্য এলাকায় ইংরেজরা পণ্য বিনিময়ের বদলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন করলে আদিবাসী গিরিজনদের সরল জীবন-জীবিকায় আঘাত আসে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সংরক্ষিত ঘোষণা করা হলে অরণ্যের অধিকার হারিয়ে তারা দাস শ্রমিক বা গৃহভৃত্যে পরিণত হয়। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তারা ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ১৯৬৮-৬৯ সালেও গিরিজনেরা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠী, সাহুকার ও অন্যান্য স্থানীয় উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ছিল মূলত স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির লড়াই। পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি তোলে জয়পাল সিং-এর নেতৃত্বের ঝাড়খণ্ড পার্টি। ১৯৪৯ সালে ঝাড়খণ্ড পার্টির জন্ম রাঁচির আদিবাসী মহাসভায়। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ‘‘অলগপ্রান্ত’’ ইস্যুতে ঝাড়খণ্ড পার্টি বিহারে ৩৩টি বিধানসভা ও ৩টি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়। এই জয় ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ২০০০ সালে বিহারের ১৮টি জেলা নিয়ে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসে উক্ত আন্দোলনগুলির মধ্যে যেগুলির সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটছে, তাকেই আন্দোলনের কালানুসারে বিশ্লেষণের প্রয়াস করা আছে এই অধ্যায়ে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল তার গ্রামসমাজ। বিভিন্ন যুগে ভারতে বিদেশি শক্তির আক্রমণ ঘটেছে, কেউ লুণ্ঠন করে ফিরে গেছে, কেউ বা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। কিন্তু, প্রাচীন এই গ্রামসমাজ বা কৃষি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে উৎপাদনের বণ্টন নিয়ে বিরোধ ছিল ঠিকই, এমনকি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকেরা পিষ্ট হয়েছে, বিদ্রোহও করেছে। কিন্তু পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির কাছে বাংলার নবাবের পরাজয় যুগ

পরিবর্তনের সূচনা করে। যদিও মোঘল শাসনের শেষদিক থেকেই এই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ভিতে ভাঙন দেখা গিয়েছিল। গ্রামসমাজের কর আদায়কারীরা উৎপীড়কের ভূমিকা নিয়েছিল এবং ঘৃণিত আমলা বা গোমস্তায় পরিণত হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলা শাসনের নির্ধারকের ক্ষমতা ভোগকারী ইংরেজরা বক্সারের যুদ্ধ জয়ের পর বিজিত মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে পায় বাংলা-বিহার-ওড়িশার মতো সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অংশের দেওয়ানি। দেশীয় শাসককে সামনে রেখে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লুট করছিল বাংলা-বিহারকে। শুধু তাই নয়, সুপ্রকাশ রায় লিখছেন- "বাংলা ও বিহারের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ বণিকরাজ বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে ইংরেজ-বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানত শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ-বণিকেরা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার পূর্বে দীর্ঘকাল বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পণ্য-ব্যবসায়কে সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করিতে পারে নাই।...এত দিন গ্রাম- সমাজের অচলায়তন ইংরেজ–বণিকদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পর্বতের মত বাধা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সুতরাং এবার তাহারা গ্রাম-সমাজের বাধা ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের কঠিন খোলস ভাঙিয়া কৃষককে মুক্ত করা এবং বণিক রাজ্যের পণ্য-ব্যবসায়ে ও ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের যন্ত্ররূপে তাহাদের ব্যবহারের মারফত ভারতীয় কৃষককে ইংরেজ বণিকরাজের একচেটিয়া শোষণের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।"[১] প্রাচীন গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করবার জন্য তারা মূলত দু'টি হাতিয়ারের সাহায্য নেয়- (১) নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ও (২) ভূমি-রাজস্ব হিসেবে ফসল বা দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন। ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল বিপুল পরিমাণে রাজস্ব আদায়। সেই কারণে পূর্বের জমিদারদের ওপরেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থাকলেও

তার ওপর তদারকি করার জন্য সুপারভাইজার বা তদারককারী নিয়োগ করে কোম্পানি। পরবর্তীকালে এই পদের বদলে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিটি জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই কালেক্টরদের ওপর দায়িত্ব পড়ে কর ধার্য করার। জমি সম্পর্কে কোনওরকম অনুসন্ধান না করেই বর্ধিত হারে রাজস্ব স্থির হয়। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, আদায়ের প্রক্রিয়াকে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে কোম্পানি যথাক্রমে একশালা, পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্ত করে। অবশেষে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবমতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী শুধু বিপুল পরিমাণ রাজস্বই স্থির করা হয়নি, বছরের নির্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্ত হওয়ার আগে এই রাজস্ব কোম্পানির ঘরে জমা না পড়লে জমিদাররা জমির অধিকার হারাতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের কৃষকের এতদিনের পুরুষানুক্রমিক অধিকার কেড়ে নিল। জমি পণ্যে পরিণত হল। জন্ম নিল ইংরেজ অনুগত এক নতুন জমিদার শ্রেণি। আর এখানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক গুরুত্ব। বিপুল রাজস্বের বোঝায় নিঃস্ব কৃষকদের ঋণের বেড়িতে বাঁধতে মহাজন শ্রেণির জন্ম হল।

মহাশ্বেতা দেবী স্বীকার করে নেন- "১৭৮০-৮৫ বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহই প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ। সে সময় ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্ভবত এই প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়, অন্তত পূর্বভারতে। রাজমহলে ছিল সাঁওতাল ও পাহাড়িয়ারা। কিছু পাহাড়িয়া ইংরেজদের সঙ্গে ছিল, অধিকাংশই ছিল সাঁওতালদের সঙ্গে।"[২] *হুলমাহা* (১৯৮২, শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত) উপন্যাসেও তিলকা মাঝির উল্লেখ রয়েছে। *হুলমাহা* উপন্যাসের পরিধিও তাই সম্পূর্ণ হয় তিলকা মাঝি বা প্রথম সাঁওতাল আন্দোলনের ওপর লেখা *শালগিরার ডাকে* (১৯৮২) গল্পকে নিয়েই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের জন্য জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানোর দিকে নজর দেয়। রাজমহল থেকে হাজারিবাগ, মুঙ্গের, উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিণে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের

পশ্চিম অংশ পর্যন্ত ছিল দুর্ভেদ্য ঘনজঙ্গল। পাহাড়িয়া, মালপাহাড়িয়াদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সাঁওতালও থাকত এখানে। নবাবের আমলে কাউকে খাজনা দিয়ে বাস করেনি এরা, গল্পে পাওয়া যায়- "সমাজপতিরা হাসল। কে রাজা? কে শাসক? আমরা কাউকে কর দিই না। সুবাদার? কোনো সুবাদার আজও আমাদের ঘাঁটায় নি। ধান দিয়ে তুলো বা সুতো আর লবণ আনি। বাস্, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক খতম।"[৩] অথচ, বাইরের জগৎ থেকে সম্পর্করহিত এই মানুষগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় ভারতের বৃহৎ রাজনৈতিক পটভূমিতে। দক্ষ আখ্যানের বুনটে মহাশ্বেতা দেবী ভারতের যুগ পরিবর্তনের ঘটনাপ্রবাহকে জুড়ে দিলেন তিলকার জীবনের সঙ্গে- "তিলকার বয়েস যখন দশ বছর, সেই ১৭৬০ সালে কোম্পানি বুঝল, মীরজাফরকে দিয়ে আর সুবিধে হবে না। গাই বুড়ো হলে কি দুধ দেয় আর? মীরজাফরকে হটিয়ে তারা নবাবের জামাই মীরকাশেমকে নবাব বানাল। মীরকাশেম কোম্পানির দাবিদাওয়া মেটালেন। বর্ধমান, চট্টগ্রাম আর মেদিনীপুর নামে যশে গেল কোম্পানির হাতে। ভ্যান্সিটার্ট পেলেন সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। হরওয়েল পেলেন চার লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা। কোম্পানির অন্য আমলারা পেল দেড় লক্ষ থেকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। তিলকা যখন চোদ্দো বছর বয়েসে রাজহংসীর স্বপন দেখছে, তার তা জানা ছিল না কোথায় বক্সারে হেরে যাচ্ছেন মীরকাশেম কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে। ১৭৬৪ সালে মীরকাশেম হেরে ফৌত। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির হাতে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানির ভার।"[৪] পাহাড়িয়া কর্তৃক কোম্পানির ডাক লুঠের ইতিহাস মেলে। ইতিহাসের বন্য ও হিংস্র প্রকৃতির পাহাড়িয়াদের কোম্পানির ডাক লুণ্ঠনের পেছনে কারণের অনুসন্ধান করলেন গল্পকার এবং তৎকালীন পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, যে জঙ্গল ও পাহাড়ে ছিল তাদের নিরঙ্কুশ অধিকার, সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা বানাচ্ছে কোম্পানি। সেই রাস্তা দিয়ে যাবে ডাক, হয়তো বা সেই রাস্তা দিয়েই জঙ্গল ও পাহাড়ের ওপর এই আদিবাসীদের

অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে একদিন আধিপত্য কায়েম করবে। শুধু তাই নয়, গল্পকার দেখালেন এই পাহাড়িয়াদের থেকে কোম্পানির লোক ধান কেনে মুদ্রায়, যে বিনিময় ব্যবস্থার সঙ্গে তারা এতকাল পরিচিত ছিল না; শুধু তাই নয়, সিকি প্রতি যে চাল বিক্রি করেছিল এক মণ, সেই চাল আবার কোম্পানির থেকে কেনে প্রতি সিকি আট/দশ সের। গল্পকার দেখালেন চাষ করে প্রাচীন ব্যবস্থায় বেঁচে থাকা মানুষগুলো সেদিন ডাক লুঠ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কোম্পানির কারণেই- "শীতের হিমে কুর্‌থি চাষ করব। কুর্‌থি দানা ছড়িয়ে নামুতে নামব। যার আছে তার লুটে নেব। আর কোম্পানির ডাক লয়ে নয়াসড়ক ধরে যাবে তো তারে মারব। কোম্পানি ডাকাতিটা শিখাল।"[৫] ইতিহাসে রাজনীতিতে দুর্ধর্ষ লুঠেরা এই পাহাড়িয়াদের দমন করতে সেদিনের কোম্পানি ১৭৭২ সালে ক্যাপ্টেন ব্রুককে পাঠিয়েছিল। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভর করে বা পাহাড়িয়াদের শক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় মাত্র একশো সৈন্যের ছোটো ফৌজ নিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন পাহাড়িয়াদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বা বিদ্রোহ দমন করতে। পাহাড়িয়ারা জঙ্গলের মধ্যে থেকে তির ছুঁড়ে অধিকাংশ সিপাহিকে হত্যা করছে দেখে ব্রুক ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। ইতিহাসনিষ্ঠ মহাশ্বেতা দেবী এই যুদ্ধের বর্ণনা করছেন এইভাবে– "তিতাপানি নালার কাছে এসে ব্রুক ও তার সেপাইরা নালা পার হয়। হড়কা পাথর। বালি ও পাথর। জঙ্গল শুরু। এগোয়। আর হঠাৎ বেজে ওঠে পঞ্চাশটা নাগারা। ছুটে আসে তির। সেপাই একশো। বন্দুক দশটি। তরোয়াল অনেক। ব্রুক গুলি ছোঁড়ে ও বলে, গুলি করো, গুলি করো।– গুলি যায় বেদিশা। তির আসে বাতাস কেটে। সেপাই মরে। তির পাঁজরে, তির বুকে। তিরের ফলা ও লেজা ওজনে সমান। তাতে ভারসাম্য আসে। আর স্থির নিশানায় তির ছুটে এলে তাকে এড়ানো খুব কঠিন। কয়েকজন সেপাই পড়ে যেতেই অন্যরা পালাতে থাকে। ব্রুক চেঁচায়, যে পালাবে তাকে গুলি করব। কিন্তু ব্রুকের ঘোড়ার পাঁজরে তির। যন্ত্রণায় হ্রেষারব করে ঘোড়া ছুটতে

থাকে। এখন ব্রুক নেই। ছত্রভঙ্গ সেপাইরা পালাতে চায়।"[৬] ১৭৭৩ সালে রাজমহলের সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে আসেন অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড। ১৭৭৯ সালে তিনি ভাগলপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হন। কালেক্টর পদে আসীন হয়েই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ বা লুঠকে বন্ধ করা। কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লিভল্যান্ড বুঝেছিলেন ব্রুকের মতো শক্তি প্রয়োগ করে তিনি পাহাড়িয়াদের বশ করতে পারবেন না। তাই তিনি আশ্রয় করেছিলেন বন্ধুত্বের পথ। আলাপ-আলোচনা ও কিছু সুযোগ–সুবিধা দিয়ে তিনি অচিরেই হয়ে উঠেছিলেন পাহাড়িয়াদের ''চিলিমিলি সাহেব''। গল্পকার লিখছেন- "বেজায় বন্ধু কলেক্টর ক্লিভল্যান্ড। পাহাড়িয়ারা নাম দিল চিলিমিলি সাহেব। চিলিমলি সাহেব বৈঠক করে। চিলিমিলি সাহেব আসে। পূজাপরবে।"[৭] বছরে দু'বার হওয়া এই বৈঠকেই তিনি জেনে নিয়েছিলেন সাঁওতালদের সম্পর্কে, সাঁওতাল–পাহাড়িয়াদের সম্পর্ক সম্বন্ধে। কোম্পানির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য তিনি পাহাড়িয়া সর্দারদের জন্য মাসিক দশ টাকা ও মাঝিদের জন্য মাসিক দু'টাকার ব্যবস্থা করেন এবং নীল জামা ও লাল পাগড়িরও। বহু পাহাড়িয়াদের কোম্পানির ফৌজে নিযুক্ত করে নেন। "জানা যায়, ১৭৮০ সালে চার শ' পাহাড়িয়া সিপাহী নিযুক্ত হয়েছিল।"[৮] কৌশলে তিনি পাহাড়িয়াদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কোম্পানির উপর ডাকাতি আটকাতে পেরেছিলেন, এরপরেই তাদের নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন পাহাড়ের প্রান্তদেশে, যাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন দামিন-ই-কোহ। এই জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা থাকবে এবং কোনও খাজনা দিতে হবে না। কিন্তু সেখানে থাকা সাঁওতালদের জন্য তিনি খাজনা চালু করলেন। পাহাড়িয়ারা নীচে নামতে রাজি হয়নি। এতদিন ধরে নবাবের আমলে সাঁওতালরা নিষ্করভাবেই সেখানে বাস করছিল। সাঁওতালরা মনে করেছিল কোম্পানি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে, তাই তারা কোম্পানির নির্দেশ অমান্য করেছিল, খাজনা দেয়নি। এই খাজনাকে কেন্দ্র করেই সাঁওতাল-কোম্পানি বিরোধ বাঁধে। কোম্পানি সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি

জ্বালিয়ে দেয়, সর্বস্ব লুঠ করে। গল্পকার এই ইতিহাসকে গল্পে নির্মাণ করলেন এইভাবে- "ক্লিভল্যান্ডের নির্দেশ- জঙ্গল-এলাকার ভিতরে কতগুলি গ্রাম আছে সঠিক জানি না। কেউ কোনোদিন ঢোকেনি। খানিক পাহাড়, বেশিটা জঙ্গল। যেন প্রকৃতি রচিত এক সুবিশাল দুর্গ। তাই সাহস করে ঢুকবে। গ্রামকে-গ্রাম পিপল করে ছাড়বে। গ্রাম জ্বালাও, গুলি চালাও। বুনো বর্বর মানুষগুলি বুঝবে আমরা বেশি শক্তিশালী। ভয়ের চোটে বশ মানবে।"[৯] ক্লিভল্যান্ডের এই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল সুন্দ্রা মাঝির ছেলে তিলকা মাঝি। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে বহু সাঁওতালের মৃত্যুর পর তিলকার ছোঁড়া বাঁটুলের আঘাতে মারা যায় ক্লিভল্যান্ড, ১৭৮৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি। ছোটো থেকেই তিলকা তির ছোঁড়ার পাশাপাশি বাঁটুল ছোঁড়াতেও পারদর্শী ছিল। ক্লিভল্যান্ডের মৃত্যুর পর কোম্পানির ফৌজ আরও নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমনে নেমে পড়েছিল। সাহায্য পেয়েছিল নব্য জমিদারদের। সাঁওতাল দেখা মাত্র গুলি করেছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে সাঁওতালদের গ্রামগুলোকে। তিলকারা লড়েছিল তির-বাঁটুল-টাঙ্গি দিয়ে বন্দুক ও বেয়নেটের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম "হুল"। প্রায় একবছর এই লড়াইয়ের শেষে তির ও খাবারের শেষে তিলকা ধরা পড়ে তিলকপুরের জঙ্গল থেকে- "তিলকা ধরা পড়লেন। তাঁকে ভাগলপুরে ধরে এনে নিদারুণভাবে চাবুক মারা হল এবং ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে সমস্ত শহরে টেনে হিঁচড়ে ঘোরানো হল। এতেও তাঁর মৃত্যু হল না দেখে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হল।"[১০] আর সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ণিয়া, সারণ, সাহাবাদ, সিংভূম, ধানবাদ, হাজারিবাগ, মুঙ্গের, রাঁচি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ, কেওনঝড় প্রভৃতি অঞ্চলে। গল্পকার দেখিয়েছেন ধর্ম দ্বারা চালিত সাঁওতাল সমাজ এই বিপদের আঁচ পেয়েছিল তিলকার তাদের আদি মাতা শ্বেতরাজহংসের পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে। লড়াইকে এইভাবে তারা মিলিয়ে দেখেছিল নিয়তিবাদের সঙ্গে। ১৭৮৫ সালে ভাগলপুরের যে বটগাছে তিলকা মাঝিকে ঝোলানো হয়েছিল, সেই বটগাছটা

দেখে আসার কাহিনি শুনিয়েছিল চুনার মুর্মুর ছেলে সিদু *হুলমাহা* উপন্যাসে। অন্যদিকে, এদেশের মূল অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্করহিত এবং ধারণারহিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্লিভল্যান্ডের পাহাড়িয়া বশের নীতির ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর মৃত্যুফলকে লিখেছিল– "Without bloodshed or the terrors of authority, enploying only the means of conciliation, confidence, and benevolance, he attempted and accomplished the entire subjection of the lawless and savage inhabitants of the Jungle-Terry (forest frontier) of Rajmahals, who had long infested the neighbouring lands by their predatory incursion, inspired them with a taste of the arts of civilised life, and attached them to the British Government by a conquest over their minds- the most permanent as the most rational mode of dominion."[১১] ১৭৯০ সালের পর থেকে বীরভূম, বাঁকুড়া, দুমকা, ভাগলপুর তথা ''দামিন-ই-কোহ''তে সাঁওতালরা ফিরতে লাগল। দুর্গম বন-জঙ্গল কেটে ঘর বাঁধল। একে একে প্রতিষ্ঠা করল গ্রাম-সমাজের, সগড় ভাঙায়, পিপড়া, আমগাছিয়া। ১৮০৯ সালে দুমকা ও ১৮১৮-তে তারা গোড্ডো মহকুমায় প্রবেশ করল। ১৮১৮ সালেই সাদারল্যান্ড ভাগলপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পান এবং তিনি ''দামিন-ই-কোহ''র সীমানা নির্দেশের সুপারিশ করেন। সরকারের ইচ্ছায় এই কাজের ভার পড়ল জন পেটি ওয়ার্ডের ওপর। পেটি ওয়ার্ড সহযোগী ক্যাপ্টেন ট্যানারকে নিয়ে ১৮৩৩ সালে ''দামিন-ই-কোহ''র সীমানা নির্দিষ্ট করেন- "The Damin-i-koh, formed in 1832-33 within a definite boundary, demarcated by Mr. John Petty Wood, of the Civil Service, in company with Caoptain Tanner as Surveyor, was distributed among the districts of Bhagalpur, Murshidabad, and

Birbhum. It comprised 1366·01 square miles, of which the space not occupied by the hills was 500 square miles. Of the latter, 246 square miles "were in the survey of 1850 still covered with jungle," the rest or 254 miles being cleared."[১২] দামিনের সীমা নির্ধারণের পরেই লর্ড বেন্টিঙ্ক জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে বসবাসযোগ্য ও কর্ষণযোগ্য করে তোলার জন্য সাঁওতালদের আহ্বান করেন। সিদ্ধান্ত হয়, তিন বছর খাজনা দিতে হবে না, তিন বছরের পর জমির মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে নামমাত্র খাজনা নেওয়া হবে। এ সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে সাঁওতালরা এসে এখানে বসতি গড়ে তোলে। W. W. Hunter তথ্য দিচ্ছেন- "Between 1838 and 1851 the population within the pillars increased from 3000 to 82,795, besides 10,000 on the outskirts."[১৩] খাজনা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি অচিরেই মিথ্যে প্রলাপে পরিণত হয় এবং বিপুল হারে খাজনা আদায় করা হয়। ১৮৩৬ সালে এই অঞ্চলের পরিদর্শন ও খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হয় জেমস পন্টেটকে। ১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৫৪-৫৫ পর্যন্ত এই খাজনা আদায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শুধু বিপুল খাজনা আদায়ই নয়, আদায়ের পন্থা নিয়েও সাঁওতালরা বিক্ষুব্ধ ছিল। জানা যায়, "In 1838 the annual ground rent of the Damin-i-koh amounted to 2000 rupees and the number of Santal villages to nearly 40...But by the 1851 Mr. Pontet raised the annual rent to Rs.43,918-13-$5^{1/2}$, and the number of Santals,...increased to 82,795 souls living in 1,473 villages, of which only 1,164 paid rent."[১৪] পন্টেট একদল নায়েব-সুজাওল বা দারোগাকে এই খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত করেন, যারা শুধু খাজনা আদায় করেই ক্ষান্ত থাকত না, বিভিন্ন কর ও সেলামিও আদায় করত। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি, কারণ পন্টেট নিজে এইসব অভিযোগের তদন্ত না

করে সেই সব দারোগাদের কাছেই দরখাস্তগুলো পাঠিয়ে দিতেন বিচারের জন্য, ফলে বিচার যে অত্যাচারিত সাঁওতালরা পায়নি, তা বলাই বাহুল্য। সাঁওতালরা দামিন-ই-কোহ মাটিকে ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে দেখে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ভাগলপুর থেকে ব্যবসায়ী ও মহাজনের দল এখানে আসতে শুরু করে। তখনও দামিন বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত থাকায় বহু বাঙালি ব্যবসায়ীও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। পন্টেট সাহেবের মূল দপ্তর বারহাইত ছিল সমৃদ্ধ গ্রাম ও মূল বাণিজ্যকেন্দ্র। বারহাওয়া রেলস্টেশন থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে এই বারহাইতে সপ্তাহে দু'বার হাট বসত এবং আশে পাশে সাঁওতাল গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণে ধান, সরিষা, তিল, তিসি জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা হয়ে ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত। বিনিময়ে সাঁওতালরা পেত সামান্য অর্থ, অথবা নুন, তামাক বা কাপড়। বিনিময়ের সময় সরল, অশিক্ষিত সাঁওতালদের ঠকানো হত। সাঁওতালরা যত ফসলই দিক না কেন বিশ সের কখনওই হত না। অসহায় সাঁওতালরা "বিশ" শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠত। *হুলমাহা*তে মহাশ্বেতা দেবী এই ছবিও অঙ্কন করেছেন। অন্যদিকে, ফসলের সঠিক মূল্য না পাওয়ার কারণে দারিদ্র্য সাঁওতালদের পিছু ছাড়েনি, অভাবী সাঁওতালরা বিভিন্ন সময়ে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিলে চড়া সুদে সাঁওতালদের শ্রমের ফসল তারা আদায় করে নিত। ফলে, সাঁওতালদের উৎপন্ন ফসলের বেশিরভাগটাই চলে যেত ইংরেজ ও ব্যবসায়ী-মহাজনদের গুদামে। এই শোষণের প্রতিকার ইংরেজ কর্তৃক সম্ভব ছিল না এ কারণেই যে, এতে ইংরেজদের লাভই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। *হুলমাহা* উপন্যাসে সিদু বলছে- "কোম্পানিতে জমিদারে-মহাজনে বিয়া বসেছে। কোম্পানি স্বামী, জমিদার-মহাজন তার দুই বউ। আমলা, গোমস্তা, পেয়াদা, কারকুন, আমিন, নায়েব, পুলিশ, তার ছেলের পাল। কোম্পানির ছোটভাই নীলকর সাহেব।"[১৫] ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কত সহজে সিদু শোষণের চেনটাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই উপলব্ধি থেকেই সে বুঝেছিল বিদ্রোহভিন্ন এই শোষণ

থেকে মুক্তি নেই। মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে আটকা পড়লে সেখান থেকে মুক্তি নেই। উপন্যাসে পাই, মহাজনের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাঁওতালদের ধান ও টাকা ধার দেয়, বদলে টিপছাপ নেয়। ফসল উঠলে সেই ঋণের ফসল তুলে নেয়, কিন্তু ঋণের শোধ হয় না। এক গাড়ি ধান মহাজনের হিসেবে দশ সের হয়। বাকি ঋণ শোধ দিতে দিতে একজন সাঁওতাল হয়ে যায় মহাজনের "বান্ধাবেগার"– "বাঁধাবেগার কি হবে? বাপ তোমার ঘরে বেগার খেটে মরে যাবে, ছেলে আসবে বাপের ঋণ শোধ করতে। তারপর আসবে তার ছেলে। সাঁওতালটি বুঝতে পারছিল যে, কর্জ তার শোধ হল না। কপালে তার অশেষ দুঃখ আছে।"[১৬] বেগার প্রথার চরমতম দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন ঔপন্যাসিক- "পবন মাঝি তিন টাকা শুধতে তিরিশ সাল বেগার খাটে।"[১৭] *হুলমাহা* উপন্যাসের শুরুই পিপলা গ্রামের মহাজন নগিন দাসের পালিয়ে আসা বাঁধা বেগার ধনরাম টুডুর প্রসঙ্গে। চেহারার বর্ণনায় পাওয়া যায়- "সিদু লোকটিকে টেনে নিয়ে একটি গাছের নীচে দাঁড়ায়। হাত ধরতে সে বোঝে লোকটি কত রোগা। বিদ্যুৎচমকে দেখে বস্তুত সে হাড়-চামড়া সার। মাথার চুলে জট, গলায় একটি কাঠের পদক, কোমরে কৌপীন। লোকটির শরীরে থিরথির কাঁপুনি। কতদিন বুঝি পেটে ভাত নাই, চোখে ঘুম নাই, আহা!"[১৮] পায়ে লোহার বেড়ি, মাংস কেটে বসে গেছে শরীরে। ধনরাম পালিয়ে আসায় তার বাড়িতে নগিনদাসের পেয়াদা ধরে আনতে যায় তার বাবা ও ভাইকে। ধনরামের মাত্র তিন টাকা সাত বছর বেগার খেটেও শোধ হয় না। এভাবে সামান্য ঋণের কারণে সাঁওতালরা আজীবন মহাজন বা জমিদারের ক্রীতদাস হয়ে যেত। মরলেও সেই ঋণ শোধ হত না, বংশ পরম্পরায় সেই ঋণ শোধ করতে হত ছেলে বা নাতিকে। কোম্পানি এই বর্বরতার প্রতিকার তো করেই নি, বরং পালিয়ে যাওয়া কামিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ হলে আদালত থেকে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোত। তাই, শুধু জমির অধিকার, জঙ্গলের অধিকার নয়, সাঁওতাল বিদ্রোহের অবশ্য

কারণ ছিল এই বন্দিজীবন থেকে, অপমানের জীবন থেকে মুক্তিও। মহাজনেদের নির্লজ্জ বঞ্চনা ও শোষণের পরিচয় মেলে কালীকিঙ্কর দত্তের গ্রন্থে- "Furthur, those money-lenders kept two sets of weighing scales- (1) *Kenaram* or *Bara Bau*, the capacity of which was a little more then that the ordinary measure and which was used by them for weighing the crops that they took from their debtors, and (2) *Becharam* or *Chota Bau*, the value of which was used for weighing articles lent to the Santals by them. They also charged extraordinarily high rates of interest."[১৯]

শুধু জমিদার মহাজনদের শোষণই নয়, দামিনের সাঁওতালদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল আড়কাঠি আর নীলকর সাহেবরা, যুক্ত হয়েছিল রেলের কাজ করতে আসা ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারও। ১৮৫৬ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা জানিয়েছিল, রেলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা বিনামূল্যে সাঁওতালদের কাছ থেকে জোর করে মুরগি, পাঁঠা কেড়ে নিয়ে আসত, সাঁওতালরা প্রতিবাদ করলে অত্যাচার চালাত, দু'জন সাঁওতাল রমণীর ওপর তারা পাশবিক অত্যাচার করে এবং একজন সাঁওতালকে হত্যা করে।[২০] সাঁওতাল রমণীদের ওপর কুনজরের প্রসঙ্গ উপন্যাসে এনেছেন মহাশ্বেতা দেবী। রেল সাঁওতালদের জীবনে ভালো কিছু বহন করে আনেনি, বরং জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত সাঁওতালরা চলে যাবে আড়কাঠিদের সঙ্গে দূরের কোনো চা-বাগানে আর দামিনে আরও আসবে "দিকু" ব্যবসায়ীরা তাদের অত্যাচার করতে ও ফসল লুঠ করতে- এ ভাবনাতেই তাদের কাছে রেল হয়ে উঠেছিল তীব্র ঘৃণার। রেলের কর্মচারীদের নির্যাতন ও সাঁওতাল রমণীদের অবমাননা ছাড়াও রেলের উপর আক্রোশের একটা কারণ অরণ চৌধুরী দেখিয়েছেন- "আরেকটি ঘটনা, তা হল পাহাড় ভেঙে চুরমার হওয়ার ঘটনা, 'বুরু' (পর্বত) সাঁওতালদের উপাস্য

দেবতা। 'মারাং বুরু' ওঁদের ভগবানতুল্য। রেলপথ বসানোর কাজে নিরত সাহেবেরা সেই পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। যেখানে স্বয়ং দেবতাই বিধ্বস্ত, সেখানে ওঁরা দাঁড়াবে কোথায়? ওঁদের সরল ও আদিম মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল। সব মিলিয়ে জেগে ওঠার ডাক। ডাক প্রতিকার প্রার্থনা ও প্রতিবাদের, সেখান থেকে প্রতিরোধের।"[২১] তাছাড়া রেল তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছিল তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জঙ্গলও।

ইতিহাসনিষ্ঠ মহাশ্বেতা দেবী সিদু'র সুবারাজা হওয়ার প্রেক্ষাপটের ঘটনাগুলোর প্রতিও বিশ্বস্ত থেকেছেন। জানা যায়, এ সময় লিটিপাড়ার ইশ্‌রি ভকত, তিলক ভকত বাগসীসা গ্রামের জিতু কলু ও দরিয়াপুরের বেশ কিছু মহাজনদের বাড়ি ডাকাতি হয়, যদিও সাঁওতালদের বিরুদ্ধে এই ডাকাতির অভিযোগ নিয়ে সংশয় রয়েছে। এরই কিছু পূর্বে ১৮৫৪ সালে লছিমপুর গ্রামের প্রধান বা মাঝি বীরসিং, বোরিও গ্রামের বীরসিং মাঝি, সিন্দ্‌রি গ্রামের কাওলে পারানিক, হাটবান্ধার ডমন মাঝি প্রমুখের সঙ্গে জোট করে মহাজনদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ও বান্ধাবেগার হওয়া থেকে গ্রামের লোকেদের বাঁচাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে কামারদের কাছ বাটখারা বানিয়ে নেয়, ওজন শিখে নেয়। এই খবর ও জোট মহাজনদের যে ভালো লাগেনি, তা বলাই বাহুল্য। তবে এ বিষয়ে অন্য তথ্যও দিয়েছেন দিগম্বর চক্রবর্তী – "...লুচিমপুর-এর সাসান-এর এক বীরসিং পরগনাইত একদিন ঘোষণা করল যে, তাদের প্রধান দেবতা চান্‌দো বোঙ্গা বজ্রনির্ঘোষে আবির্ভূত হয়ে তার কাছে সঞ্চারিত করে গিয়েছেন ঐশী-প্রেরণা, শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন ঐন্দ্রজালিক সূত্র-যা পাঠ করলেই যে কোনও মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যাবে। নিতান্ত অজ্ঞ সাঁওতালদের কাছে এ-কাহিনির তাৎপর্য ছিল বিরাট। প্রতিদিনই তারা বীরসিং পরগনাইতের কাছে গিয়ে শিখতে আরম্ভ করল ওই আশ্চর্য যাদু-কৌশল।... বীরসিং পরগনাইত-এর নেতৃত্বে দল ওঠে...। দিকুরা বুঝল সশরীরে উপস্থিত থেকে

সাঁওতালদের কার্যকলাপ বোঝা একেবারেই অসম্ভব। তখন বাধ্য হয়েই অন্য পথ ধরতে হল তাদের।"[২২] ফলে, ডাকাতির অভিযোগের সঙ্গে লছিমপুরের বীরসিং-এর নাম যুক্ত করে তারা অভিযোগ জানায় পাকুরের রানি ক্ষেমাসুন্দরীর কাছে। পাকুরের দেওয়ান জগদ্বন্ধু রায় নায়েব ও মহাজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে বীরসিংকে কাছারিতে ডেকে পাঠান এবং মোটা টাকা জরিমানা করেন ডাকাতির অভিযোগ এনে। বীরসিং তা দিতে অস্বীকার করলে সকলের সামনে তাকে জুতো পেটা করা হয়। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত বীরসিং-এর দল সত্যি সত্যি মহাজনদের বাড়ি লুঠ করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের ওপর নির্দেশ আসে সাঁওতাল দমনের জন্য। মহেশ দারোগা পুলিশ নিয়ে সাঁওতাল দমনের নামে নিরীহ সাঁওতালদের ওপর অত্যাচার চালায় মহাজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে- "The measure adopted by Mahesh Lal Daroga to suppress the dacoities and other disorders, greatly intensified the discontent of the Santals."[২৩] অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সম্মানিত সাঁওতালরাও এই অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। ঔপন্যাসিক ধনী সাঁওতাল গোচ্চো, লিটিপাড়ার বিজয় মাঝি ও আমগাছিয়ার গর্ভু মাঝির ওপর মহাজন-পুলিশি নির্যাতনের ঐতিহাসিক সত্যের সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটিয়েছেন। সাঁওতালদের মধ্যে তুলনামূলক ধনী সাঁওতাল গোচ্চোর ওপর নেমে আসা মহেশ দারোগার অত্যাচার, আমড়াপাড়ার কেনারাম ভকতের কাছে কুড়ি ঝুড়ি ধানের ঋণ একশোতেও শোধ না হয়ে শেষ পর্যন্ত তার ঘর-জমি ক্রোক করতে আসা ও ক্রোক করতে না দেওয়ায় মহেশ দারোগার সাহায্যে জেল এবং শেষপর্যন্ত ভাগলপুরের জেলে শারীরিক ও মানসিক কষ্টে বিনাবিচারে মৃত্যু, আমগাছিয়ার গর্ভু মাঝির জমি ক্রোক করার জন্য কেনারামের পরামর্শে ভাগলপুরের জেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা– ইতিহাসের সত্যতাকে যথার্থই তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক। এইসব দীর্ঘদিনের অত্যাচারের ফলে সঞ্চিত ক্ষোভই যে

বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিল, ঔপন্যাসিক তা স্পষ্ট করলেন এইভাবে- "লিটিপাড়ার সাঁওতালরা বলল, কেনারাম ভকত আর মহেশ দারোগা, দুজনার রক্তে হাত রাঙাব তবে জানব যে বিজয় মাঝির তেলনাহান হল।"[২৪]

এইভাবে বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয়, ধর্মভাব দ্বারা চালিত সাঁওতালরা হঠাৎই বিদ্রোহ ঘটিয়ে ফেলেনি; বরং এত নির্যাতন সত্ত্বেও অপেক্ষা করেছিল কোনো দৈবী নির্দেশের। ঠাকুরের আদেশ পেলেই গিরা পাঠানোর মধ্যে দিয়ে একত্র হওয়ার ডাক আসবে। সেই গিরা বা ধর্মের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না কোনো সাঁওতাল। সিদু-কানুর কাছে "ঠাকুরের আদেশ" যেভাবে এসেছিল বলে জানা যায়- "Religion often acts as a great stimulating force among the average masses; and here also the story of a miraculous divine revelation inspired the Santals to take prompt and open measures for the removal of their distresses. The revelation came all of a sudden. Sidhu and kanhu "were at night seated in their home, revolving upon many things (in their mind)...; a bit of paper fell on seedoo's (Sidhu's) head, and suddenly the Thakur (God) appeared before the astonished gaze of Seedoo(Sidhu) and Kanhu; he was like a white man though dressed in the native style; on each hand he had ten fingers; he held a white book, and wrote therein; the book and with it 20 pieces of paper, in 5 batches, four in each batch, he presented to the brothers; ascended upwards and disappeared. Another bit of paper fell on Seedoo's head, and then came two men, each having six fingers on each hand;

hinted to them the pueport the Thakoor's order, and they likewise vanished."[২৫] "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকা মূলত এই ঠাকুরের আদেশের কথা লিখেছিল। বারহাইত থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত ভাগনাডিহি গ্রামের চুনার মাঝির ছেলে সিদু বুঝেছিল ইংরেজ-জমিদার-মহাজনদের মতো শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে ধর্মচেতনাই সবচেয়ে কার্যকরী। মহাশ্বেতা দেবী অবশ্য তাঁর উপন্যাসে সিদুর ঠাকুরের নির্দেশ পাওয়ায় অলৌকিকত্বের বদলে স্থান দিয়েছেন উপলব্ধি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে। লিখছেন,- "দরজা খুলে দাও বাতাস আসুক। সেই বাতাসে ঘরের সব উলট-পালট। মাথাল খসে পড়ে দেয়াল থেকে, মায়ের হাতে সিলানো কাঁথা আড়ংবাঁশে দোলে, দড়ি ও বাবুই ঘাসের শিকা দোলে, বিদ্যুৎ চমকে কালো আকাশ চিরে যায়, কুলুঙ্গিতে রাখা বাইবেলের পাতা উড়ে পড়ল। চাঁদ এনেছিল। কেমন চকচকে পাতা, নতুন কাপড়ের সুগন্ধ। কোনোদিন কির্তা এলে তাকে দেব। সিদুর গায়ে মাথায় কাগজ উড়ে পড়ল। তাই হোক, তাই!"[২৬] হয়তো সিদুর ধর্মচেতনা সাঁওতালদের বহু প্রতীক্ষিত "ঠাকুরের আদেশ"কে খুঁজতে খুঁজতে এইভাবেই পেয়েছিল। সিদু-কানু বাড়িতে ঠাকুরের থান গড়ে তুলেছিল। গিরা পাঠিয়েছিল শালপাতার বাটিতে আতপ চাল, তেল ও সিঁদুর দিয়ে। যে বিচক্ষণতায় সিদু ইংরেজ-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল, সেই বিচক্ষণতায় সে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল। সিদুর কাছে "দিকু" গোত্রের বাইরে এরা, কারণ শোষণের দিক থেকে উভয়ই শোষিত। বুদ্ধিমান সিদুর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে "শ্রেণিশত্রু"কে চিহ্নিত করতে ভুল হয়নি। ঠাকুরের নির্দেশ পাওয়ার পর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে শালগিরার আহ্বান পৌঁছে যায় দিকে দিকে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগনাডিহির মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বটগাছের তলায় সভা বসে। সিদু-কানুর কাছে তারা জানতে এসেছিল দৈবী আদেশের

কথা, তাদের করণীয় কাজের কথা। ঔপন্যাসিক লিখছেন- "তারা যে কত হাজার, কে তা বলবে? কে হিসাব রেখেছিল? মাঠে যদি বা দশ হাজার সাঁওতাল থাকে, আরও তো সাঁওতাল আসছিল। কারা গিয়েছিল একদিন মানভূম, হাজারিবাগ, মালদা ও পূর্ণিয়াতে জমিদারদের প্রয়োজনে,-কারা গিয়েছিল নীলকুঠির ডাকে, কারা গিয়েছিল বর্ধমানে রানীগঞ্জে রেলকুলি- কয়লাখাদান কুলির কাজ করতে–সবাই আসছিল। অজয়, সাল, বরাকর, ব্রাহ্মণী, জয়ন্তী, ধারুয়া, চন্দন, বাঁশলোই, শাখী, ভুবুতুরি, দ্বারকা,-প্রতি নদীর বালিভরা বুক তারা রাতে পেরোচ্ছিল। কতজনের সঙ্গে বউ-ছেলে-মেয়ে। যে যার চাল-চিড়ে-গুড়-লবণ বেঁধে এনেছিল। এমন আসার আর বিরাম ছিল না।"[২৭] এমন সব ছেড়ে, সব বাধা পেরিয়ে আসার গল্প ইতিহাস শোনায় না, ইতিহাস ঘটনার হিসেব রাখে আর মানুষের ভিতরকার যন্ত্রণার, সব ছেড়ে স্বপ্নের লক্ষ্যে পথে নামার তাগিদের সার্থক নির্মাণ ঘটান সাহিত্যিক। সেদিন সিদু শুনিয়েছিল তাদের প্রাচীন ইতিহাস, যে ইতিহাস তাদের কামিয়া, কুলি, দাস হওয়ার আগের স্বাধীন সমৃদ্ধ ইতিহাস, শুনিয়েছিল তিলকা মাঝির লড়াইয়ের কথা। সিদুর কথায় অত্যাচারে জর্জরিত নিস্তেজ হয়ে আসা রক্ত অধিকার বুঝে নিতে চায়, ডাক দেয় হুলের। সাঁওতালদের তৈরি করা জমিতে তাদের অধিকারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাঁওতালরাজের লক্ষ্যে কর্মপন্থা ঠিক করে। অত্যাচারীদের উচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই সাঁওতালরাজের শুভ সূচনা হবে বলে তারা মনে করে। ঠিক হয় কির্তা, ভাদো, সুন্ডা লিখতে পড়তে জানে, তারা চিঠি লিখবে সরকারকে, তারপর তারা রওনা দেবে কলকাতার উদ্দেশ্যে- "It has been said that letters were then written by Kirta, Bhadoo and Sunno Mahjhis at Sidhu's "direction addressed to Government, to the Commissioner, Collector, and Magistrate of Bhagalpur, the Collector and Magistrate of Birbhum, to the Darogahs of Thannahs Dighee and Tikree

(Rajmahal) and to several Zamindars and others;"[২৮] বড়োলাট ডালহৌসি এবং ছোটোলাট হ্যালিডে কলকাতায় বসে দামিনে সাঁওতালদের ওপর ঘটে যাওয়া নিরন্তর অত্যাচারের খবর রাখেননি। রাখার চেষ্টাও করেননি। কারণ, ইংরেজ কোম্পানির কাছে সময়ে সময়ে পৌঁছে যাচ্ছিল রাজস্ব। মাত্র তেরো বছরে বিপুল হারে বেড়েছে রাজস্ব আদায়। কলকাতার উনিশ শতকের রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত শিক্ষিত মানসও সেদিন এই রক্ত-ঘামে ভেজা মানুষের যন্ত্রণার খবর রাখেনি, জানেনি ১৮৫৫ সাল নাগাদ ভাগনাডিহির নব্বই শতাংশ সাঁওতাল পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য ছিল বারহাইতের কোনো না কোনো মহাজনের কামিয়া। পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্বে গর্বিত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভারতের বুকে ঘটে চলা এই বর্বরতার খবর রাখেনি; বরং এই হিংস্র বিদ্রোহকে কঠিন হাতে দমনের প্রস্তাব দিয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী লিখছেন- "তাই 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে, 'সন্তালরা সমুদয় হন্দুই পরগণা ব্যাপ্ত করিয়া সর্বত্র লুট করিতেছে, প্রথম বারাপেক্ষা এই বিদ্রোহানল আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, শাসক পক্ষের দোষেই এবারের বিদ্রোহানল খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, শাসন হইয়াছে দুষ্কর।"[২৯] শুধু তাই নয়, মিলিটারি অফিসারের হাতে এই বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতার প্রস্তাবও "সম্বাদ ভাস্কর" করে। "সংবাদ প্রভাকর"-এ ১৩ই জুলাই প্রকাশিত হয়- "সম্পাদক প্রবর! পর্ব্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয়ে লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া সে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধ হয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না...আমি এই বিষয়ে ঐ অসভ্য পর্ব্বতীয় লোকদিগের বড় দোষি করিতে পারি না। বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে, কারণ নিকটস্থ কোনস্থানে সৈন্য থাকিলে কদাচ এরূপ হইত না।"[৩০] কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের খবর পায়নি, খবর পেয়েছে বাঙালি মহাজন-ব্যবসায়ী-জমিদারদের ওপর সাঁওতাল বিদ্রোহ চলাকালীন অত্যাচারের

খবর। ভারতের আদিবাসী মানুষ সম্পর্কে, গ্রাম জীবনের শিকড়ের সম্পর্কে শহর কলকাতার নাগরিক সমাজ জানেনি, তারা শহর কলকাতাকেই তামাম বাংলা ভ্রমে মজে ছিল, ইংরেজের রেললাইন বসানো, ডাকব্যবস্থার উন্নতিকেই মুগ্ধ হয়ে ভারতের সকলের উন্নতি বলে ধরে নিয়েছিল। কলকাতায় গড়ে ওঠা সভা-সমিতিতে বিদগ্ধ চর্চার মধ্যে তেতোর মতো এসে পড়েছিল সাঁওতালদের বিদ্রোহের কথা, তাই কলকাতা প্রারম্ভে এর কঠোর সমালোচনাই করেছিল। ইতিহাসের ঘটনার সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক নির্মাণের মধ্যে ঔপন্যাসিকের যে কণ্ঠস্বর শোনা যায় তাতে সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি স্পষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও ব্যঙ্গও ঝরে পড়েছিল- "না, উনিশ শতকের মহাজাগরণের আলো শিক্ষিত বাঙালির চোখকে এমন ধুয়ে দিয়েছিল যে কোথায় দামিনে এক বিশাল উন্নত কৃষিসভ্যতা ধ্বংস হতে বসেছে তা তাঁরা চোখ মেলে চেয়ে দেখেননি। রেলপথ ছড়াচ্ছিল, বাগিচায় চা-পাতা তোলা হচ্ছিল, চৌবাচ্চায় নীল ভিজছিল। বাঙালি বিদ্বজ্জন জানতে চাননি তার পেছনে কাদের নিরন্তর শ্রমও আছে। যারা বাল্যবিবাহ জানে না, বিধবাবিবাহ যাদের সামাজিক নিয়মে স্বীকৃত, বিধবাকে যারা পোড়ায় না, নারীকে করে না অসম্মান, তাদের খবর সেদিনের বাঙালি রাখেননি। যারা অসভ্য, তারাই যে সভ্য, যারা অনুন্নত, তারাই যে সততায় চরিত্রগুণে উন্নত, একথা বাঙালি জানত না। না জেনেই বাঙালি ভালো থাকে। না জানলে নিজেকে সবার বড়ো মনে করা যায়। সমগ্র বিশ্বের জন্য চিন্তা করা যায়। যে জানতে চায় সে অভিশপ্ত, কেননা তার রক্তে তুষানল জ্বলে যায়।"[৩১]

ভাগনাডিহির মাঠে জমায়েতের পর কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে প্রায় তিরিশ হাজার সাঁওতালসমেত সিদু যে রওনা দিয়েছিল কলকাতার উদ্দেশ্যে- এ তথ্য হান্টারের গ্রন্থেও মেলে- "The body guard of the leaders alone amounted to 30,000 men. As long as the food

which they had brought from their villages lasted, the march was orderly; but unofficered bodies of armed men roaming about, not very well knowing where they are going, soon became dangerous; and with the end of their own stock of provisions, the necessity for plundering or levying benevolences commenced."[৩২] কলকাতা যাওয়ার আগে তারা পাঁচক্ষেতিয়া যায় এবং সেখানকার কামিয়াদের মুক্ত করে, এতদিনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঠাকুরের আদেশ পাওয়া গেছে জেনেই তারা হত্যা করে মহাজন মানিক চৌধুরি, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হারু দত্তকে। ভাগলপুরে গর্ভু মাঝিকে নিয়ে যাওয়ার পথে টাঙ্গি দিয়ে হত্যা করা হয় মহাজনদের রক্ষক মহেশ দারোগাকে। হত্যা করা হয় গোড্ডা মহকুমার কড়েরিয়া থানার নায়েব সুজাওল প্রতাপনারায়ণকে। আন্দোলনের অভিমুখ হঠাৎই পাল্টে যাওয়ায় সিদু বুঝতে পারে কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে- "এরপর আর কলকাতা যাবার কোনো দরকার থাকল না। কলকাতা অনেক দূর। সাঁওতালদেশের বুকে যারা ছড়িয়ে আছে তাদের সরানো অনেক বেশি দরকার। সিদু ও কানুর বুঝতে বাকি ছিল না যে কোম্পানি সরকার ফৌজ নিয়ে এসে পড়ল বলে।"[৩৩] ১৮৫৫ সালের ৪র্থ জুলাই ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এইচ. রিচার্ডসনের কাছে যখন খবর আসে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছে, তখনও তিনি শান্ত, নিরীহ সাঁওতালরা বিদ্রোহ করতে পারে বলে বিশ্বাস করেননি। অবশ্য দু'দিন পরেই পণ্টেটকে নিয়ে তিনি রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৮ই জুলাই দারোগা হত্যার খবর পেয়ে ভাগলপুরের নবনিযুক্ত কমিশনার সি. এফ. ব্রাউন. ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার বারোজকে রাজমহল রওনা হতে নির্দেশ দেন। ১১ই জুলাই বারোজ কলগাঁ পৌঁছান। ইতিমধ্যে আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করে। বারোজ ভাগলপুরের কমিশনারকে আরও সৈন্য প্রস্তুত রাখতে বলেন। ইতিমধ্যে গোড্ডো মহকুমার কুখ্যাত নীলকর সাহেব প্যাট্রিকের

কুঠি দখল করে বিদ্রোহী সাঁওতালরা গোচ্চোর নেতৃত্বে। বিদ্রোহীর দল হিরণপুর বাজার লুঠ করে মানসিংহপুর পৌঁছলে সেখানে আরও সাঁওতালসমেত যোগদান করে ত্রিভুবন সাঁওতাল। ১১ই জুলাই বিদ্রোহীরা পাকুরের জমিদারবাড়িতে আক্রমণ চালায়। আগেই খালি হয়ে যাওয়া রাজবাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং সেখানে পাকুরে শোষক মহাজন দীনদয়াল রায়কে পেয়ে তাকে হত্যা করে। ইতিমধ্যে, ১৩ই জুলাই ম্যাজিস্ট্রেট ট্যুগুডের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের সীমান্তে সেভেন্থ রেজিমেন্ট বাহিনি তৈরি থাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং ১৫ই জুলাই তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বাঁধে বিদ্রোহীদের পাকুরের কাছে তরাই নদীর তীরে। এই সংঘর্ষে বহু আন্দোলনকারী মারা যায় এবং সিদু, কানু ও ভৈরব আহত হয়। উপন্যাসে পাই ধনরাম সিদুর খোঁজ করতে করতে যখন তরাই তীরে এসে পৌঁছায়, দেখে লড়াই সবে শেষ হয়েছে, চারিদিক নিস্তব্ধ- "বর্ষায় তরাই ঘোলাজলে পাক খেয়ে ছুটেছে। পাড়ে ইতস্তত কালো কালো শরীর। এত সাঁওতাল মরছে? যুদ্ধ কখন হল? এখানে তো সিদু-কানুর থাকার কথা ছিল। কী হল? সব গুলি লেগে মরেছে।"[৩৪] ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই মেজর বারোজ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিয়ালপুরে পৌঁছান। সঙ্গে মেজর স্টুয়ার্ট ও জোন্স। এ ছাড়াও আর তিনজন অফিসার ইজারটন, পণ্টেট ও ইডেন ভাগলপুরের কমিশনারের নির্দেশে বারোজকে সাহায্যের জন্য পৌঁছান। উপন্যাসে ইডেনের কথা বিশেষভাবে রয়েছে। ইডেন ও সামরিক গোডেলের চিন্তা ও কথোপকথন থেকে ঔপন্যাসিক সাঁওতালদের যুদ্ধের নৈতিক দিকটা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া, এই বিদ্রোহ ছিল তাদের কাছে ধর্মযুদ্ধ। কোম্পানির সরকার যখন সামরিক আইন জারি করছে, নৃশংসভাবে ধ্বংস করছে একের পর এক গ্রাম, হত্যা করছে সব সাঁওতালদের, বাদ যাচ্ছে না নারী-শিশু-বৃদ্ধেরাও, তখন তিরের ফলায় বিষের ব্যবহার জানা সত্ত্বেও তারা তা ব্যবহার করেনি জেনে ইডেনের মননে সভ্য-অসভ্যের চিরাচরিত ধারণাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়- "ইডেন অবাক হয়ে

ভেবেছিল, সাঁওতালরা রায়তদের কষ্ট দেবে না, অথচ যুদ্ধ করবে, এমন কথা ভাবছে কী করে? ওরা কি 'যুদ্ধ' শব্দটিতে ধর্মীয় শুভ্রতা আনতে চাইছে? ভীষণ অসভ্য, না চূড়ান্ত সভ্য? রক্তলোভী রাক্ষস, না, মানবতাবোধে আপ্লুত এক জাতি? অসম্ভব অবাক হয়ে যায় ইডেন। সভ্যতারবোধের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছলে তবে তো এই মানবিকতাবোধ, সকল দুঃখী মানুষের জন্য মমত্ববোধ আসে? ওরা তো আদিম, অসভ্য, বর্বর। না ওরাই সঠিক? ওদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনেক সঠিক ও দামি?"[৩৫] সামরিক সত্তার বাইরে ব্যক্তিমানুষের এই উপলব্ধিই বিদ্রোহকে সার্থক করে তোলে। পিয়ালপুর থেকে বারোজের সেনা পীরপৈতির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় গিরিসঙ্কটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের লড়াই বাঁধে। এই গিরিসঙ্কটের ওপাশের তিনটে সাঁওতালঘাঁটির দায়িত্বে ছিল যথাক্রমে চাঁদরাই মাঝি, শ্যাম পরগনাইত, গর্ভু মাঝি, বিক্রম মাঝি ও সিদু-কানুর মূল সৈন্যদলের ওপর। এখানের যুদ্ধে মারা যায় শ্যাম পরগনাইত। ওরা অন্যায়ভাবে লুঠ করতে যায়নি কারোর সম্পত্তি, শুধু বুঝতে পারেনি সুদূর ইংল্যান্ড থেকে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোম্পানির লোক কেন তাদের জমির ওপর অধিকার কেড়ে নিল। নিজেদের হৃত অধিকার, জল-জমি-জঙ্গলের ওপর অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সাঁওতালমায়ের সন্তানরা, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল- "এমন কত মায়ের কত ছেলে নেমেছে? হিসেব মেলে না। বন্দুকের সামনে সব সাঁওতালকে ওদের চোখে বোধহয় একরকম মনে হয়। কারা শুয়ে থাকল তরাইয়ের তীরে? তাদের নামে সিদু অনেক শালগাছ বুনে দেবে। হুলে যারা প্রাণ দেবে, সকলের নামে গাছ বুনে দেবে।"[৩৬] পীরপৈতির গিরিসঙ্কটে টানা পাঁচঘণ্টা যুদ্ধ শেষে পরাজিত হয় কোম্পানি। যুদ্ধজয়ের আনন্দে বিদ্রোহীরা একে একে লুঠ করল মিহিজানপুর, নারাণপুর, গণপুর। নৃশংসভাবে হত্যা করল শ্রেণিশত্রু জমিদার, মহাজনদের। এরপরই কোম্পানি সরকারের দমননীতিতে পরিবর্তন হয়, আরও কঠোর হয় দমন। সিদু-কানুর মাথার ওপর দশ হাজার টাকার, অন্য নেতাদের

জন্য পাঁচ হাজার টাকার ও নিম্নসারির নেতাদের জন্য হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে কোম্পানি সরকার। অফিসার টলমেইন বিরাট সৈন্যবাহিনি নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে অগ্রসর হলে খয়রাশোলের কাছে আন্দোলনকারীদের কাছে প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সাঁওতালদের শক্তিতে সন্ত্রস্ত কোম্পানির সামরিক সেনা এরপরই ‘‘রক্ত-আগুন ও আতঙ্ক’’ নীতি গ্রহণ করে। সেনাকে অর্থবল ও লোকবল দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসে নীলকর সাহেব ও জমিদাররা। মুর্শিদাবাদের নবাব সৈন্য, অস্ত্র ছাড়াও সাঁওতালদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন হাতি। ক্যাপ্টেন শেরউইল বারোটি সাঁওতালগ্রাম ধ্বংস করেন, গর্ডন করেন মুনহান ও মুনকার্‌তো গ্রাম, লেফট্যানেণ্ট রুবি সাতটি গ্রাম জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেন। সিউড়ি থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরে তিলাবুনি দখল নেয় সিরু মাঝির নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার সাঁওতাল। এখানেই তারা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পরিখা খুঁড়ে ও মাটির প্রাচীর তুলে দুর্গ বানায়। সেই দুর্গতে দুর্গাপূজা করে তারা, নিজেদের উৎসব না হলেও যে সব নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা তাদের লড়াইতে পাশে আছে, তাদের মনোবল বাড়াতে আড়ম্বরহীন দুর্গাপূজা করে তারা। এইসময় জঙ্গলে, পাহাড়ে আত্মগোপন করে তারা ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে লড়াই জারি রেখেছিল। ১৮৫৫ সালের ১০ই নভেম্বর ‘‘মার্শাল ল’’ বা সামরিক আইন ১৮০৪ সালের ১০ নং রেগুলেশনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী লাগু করা হয়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তুলে দেওয়া হয় সামরিক বাহিনির হাতে। নারকীয় অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে তারা দমন চালিয়েছিল। ১৮৫৬ সালের ৩রা জানুয়ারি এই আইন তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু সামরিক বাহিনির নৃশংস দমন অব্যাহত ছিল। দুখিয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবী দমনের বীভৎসতার চিত্র তুলে ধরেছেন- ‘‘অফিসারের মস্তিস্কের কোষে কোষে তীব্র প্রতিবাদ, এ যুদ্ধ নয়, এ কার্নেজ, গণহত্যা। মস্তিস্ক তাকে বলে, জার্ভিস, তুমি যুদ্ধ করছ না, গণহত্যা করছ। তার গলা থেকে

আদেশ বেরোয়, ফায়ার, ফায়ার! একসময় তির আর আসে না। এক থেকে একশো গোনে জার্ভিস। তারপর বলে, ঢোকো, ঢুকে পড়ো। ঢোকা যায় না। ঘরে অসংখ্য মৃতদেহ। একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। তার হাত পিছনে। সিপাহিটি বলে, আত্মসমর্পণ করো। রক্তের ও বারুদের গন্ধে ভারি, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সে-ঘরে বৃদ্ধকে দেখতে অত্যন্ত ভয়ংকর লাগে। দুখিয়া এর জবাবে হাতটা তুলে ঝাঁপ দেয়। জার্ভিসের সামনে সিপাহিটির মাথা টাঙিতে নেমে যায়। জার্ভিস বৃদ্ধের দিকে বন্দুক তোলে। গণহত্যা। এখন দামিনে সামরিক আইন নেই।"[৩৭]

১৮৫৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি কর্তা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সুজারামপুরের গ্রান্ট সাহেবের কুঠি লুঠ করে। যে ধর্ম তাদের বিষতির ছোঁড়া থেকে বিরত রেখেছিল, সেই ধর্মকে তারা কোম্পানির নিষ্ঠুর ও নৃশংস দমননীতি সত্ত্বেও পুরো বিদ্রোহকাল রক্ষা করে চলেছিল, তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রান্ট সাহেবের কুঠি দখল করার আগে তারা চিঠি দিয়ে সাবধান করেছিল। উপন্যাসে পাওয়া যায়- "আমাদের হুল তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ। সন্তালভূমে স্বাধীন সন্তালরাজের জন্য যুদ্ধ। ধর্মপথেই চলতে হবে। ওরা ধর্ম মানে না। কোথা কোন দেশ হতে আসি এমন জুলুম করে। ওরা মেয়ে-বুড়া-কচি ছেলে মারে। আমরা তাই করব? সন্তাল অসভ্য, সন্তাল জংলি, কিন্তু সন্তাল ওদের ধর্ম শিখাতে পারে।"[৩৮] নিরীহ নারীদের ওপর আক্রমণ যে সাঁওতালরা মেনে নেয়নি, তার দৃষ্টান্ত ত্রিভুবন সাঁওতালের ঘটনায় পাওয়া যায়। হান্টারের তথ্য থেকে পাওয়া যায়- "During these events one party of insurgents near Paharpore, under the conduct of Tribobun Sonthal, met two unfortunate English ladies, Mrs. Thomas and Miss Pell in their flight, as well as three European gentlemen, Mr. Henshawe and his two sons, who were barbarously murdered."[৩৯] সিদু যে এই নিরপরাধ নারী হত্যা মেনে নেয়নি, সে কথা

জানাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখছেন– "ত্রিভুবন তোমাদের মেমদের মেরেছিল। তাতেই সুবাঠাকুর সিদু বলেছে যে ত্রিভুবন ধর্ম মানেনি আর হুল থেমে গেলে তাকে নিশ্চয়ই এর জন্যে বিটলাহা হতে হবে। সিদু তাকে শাস্তিও দিয়েছে।"[৪০] "বিটলাহা" অর্থাৎ সমাজ থেকে বহিষ্কার। সাঁওতালরাজ স্থাপনের জন্যে, কামিয়া থেকে মুক্তির জন্য যে বিদ্রোহ সেদিন হয়েছিল তাতে সাঁওতাল রমণীরাও অংশগ্রহণ করে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থে "সম্বাদ ভাস্কর"-এর প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে জানিয়েছেন ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে এক যানারোহী পুরুষবেশী সাঁওতাল নারী সর্দার নিহত হয়।[৪১] উপন্যাসে বিশালী চরিত্রের ওপর তার ছায়া পড়েছে। সিউড়ির কাছাকাছি যাবার পরই দেখা গেল বিভিন্ন জায়গা থেকে শিকলে বেঁধে বিদ্রোহীদের বীরভূমে আনা হচ্ছে, ইতিমধ্যে মারা গেছে অন্যতম নেতা ও সিদু-কানুর ভাইয়েরা চাঁদ, ভৈরব। ফলে, খানিকটা মনোবল ভেঙে যায় বিদ্রোহীদের। অন্যদিকে, সিদু-কানুর জোর তল্লাশি চালাচ্ছে ইংরেজ। অর্থের লোভ দেখিয়ে সাঁওতালদের মুখ দিয়ে যখন সিদুর খবর পাওয়া গেল না, তখন সরকার অন্য পথ গ্রহণ করে। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে জানাচ্ছেন –"সৈন্য ও পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সাঁওতাল সিদু-কানু ও অন্যান্য নেতাদের গোপন আস্তানার খবর ইংরেজদের জানিয়ে দিল।"[৪২] মহাশ্বেতা দেবী দেখালেন, ইংরেজ সরকার বন্দি সাঁওতালদের তাদের কিছু শর্ত মেনে নেওয়ার লোভ দেখিয়ে জেনে নিয়েছিল সিদু-কানুর আস্তানার খবর। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিক করে ধরা পড়ে সিদু। পন্টেট নামমাত্র বিচারে তড়িঘড়ি করে ফাঁসি দিয়ে দেন সিদুর। যদিও কেউ কেউ দাবি করেন ইংরেজ সেনার গুলিতে মারা গিয়েছিল সিদু, তবুও মহাশ্বেতা দেবী ফাঁসির তথ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এই কারণে যে এর মধ্যে দিয়ে তথাকথিত সভ্য, ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজজাতির বিচারের প্রহসন স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। যারা শোষক আর শাসকের মারের মুখের ওপর নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখায়, বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে

চলে চেতনাকে, তারা প্রতিটা বিপ্লবে জন্মায়, বিপ্লবীর বুকে বাঁচে। তাই সিদু "মৃত্যুহীন, অন্তহীন"। কানুর ফিরে আসার গর্জনে মানুষের লড়াই ব্যর্থ হয় না, হুল ব্যর্থ হয়নি- এ খবর পৌঁছে যায় প্রতিটা বিদ্রোহীর বুকে। পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিতের অসহায় ভীরু বুকে "হুল"কে বাঁচিয়ে রাখতে কানু মৃত্যুতেও থাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- "আবার আমি আসব, ফিরে আসব, আবার, আবার আসব।"[৪৩] মহাশ্বেতা দেবীর *হুলমাহা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো গণসংগ্রাম বাংলা সাহিত্যকে, বিশেষত উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল অনেক আগে থেকেই। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর *ভাগনাডিহির মাঠে* প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। স্বল্পায়তনের এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার ওপর দাঁড় করিয়েছেন লেখক। একমাত্র কল্পিত চরিত্র সৈনিক জোন্সকে উপন্যাসের ক্যানভাসে নিয়ে এসে কখনও তার স্বগতোক্তি, কখনও ডায়েরি লেখার মধ্যে দিয়ে ইংরেজের বিবেকবর্জিত কাজের সমালোচনা করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্যবহ্নি* প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। প্রস্তাবনায় কথক পাঠককে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন ১১২ বছর পেছনে ১৮৫৪ সালে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের বাংলায় – "তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড় রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগণা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা।"[৪৪] সাঁওতাল বিদ্রোহের যে খবর ১১২ বছর পরেও লোকের মুখে জেগে আছে দেখেছেন কথক, তা বিদ্রোহীদের নৃশংসতার খবর। সেই ইতিহাস বাবু কলকাতার ইংরেজ হাত ফেরতা পত্রিকার দেওয়া ইতিহাস। সেই ইতিহাসে গর্ভিণী নারীর উদর চিঁরে দেওয়ার ভয়াবহ বর্বর অভ্যুত্থান ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত মানুষের বিপদে রক্ষা করার সাঁওতালদের শুভোবাবুর দেওয়া উপদেশের সঙ্গে সাঁওতাল হাঙ্গামার বাবু ও

ইংরেজ প্রভাবিত ইতিহাসের বৈপরীত্যে কথক আসল সত্যের সন্ধানে অবশেষে পৌঁছান নয়ন পালের কাছে। নয়ন পালের পট খোলার সঙ্গে সঙ্গে অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধান পেলেন কথক, যে ইতিহাস সাঁওতালদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ, ইংরেজদের সাঁওতাল রমণীদের ওপর দৈহিক ও যৌন নির্যাতন এবং ধর্মীয় আগ্রাসনের ছবি তুলে আনে। উঠে এসেছে সিদু আর রুকনীর মনের খবর। ইতিহাসের হয়েও *অরণ্যবহ্নি* রুকনীর ট্র্যাজিক মৃত্যুতে সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালে "বেতার জগৎ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসটি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছিলেন- "লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বিরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।"[৪৫] তিনি মনে করেছিলেন বিরসার অভ্যুত্থানকে বিচার করা উচিত তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে। ইংরেজ-লালিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুণ্ডা সমাজকে মুক্তি দিতেই বিরসার বিদ্রোহ। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি বিরসার কাহিনি নির্মাণে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে মেনে চলতে মূলত অনুসরণ করেছেন কুমার সুরেশ সিং-এর *Dust storm and Hanging Mist* গ্রন্থের। বারবার ঋণ স্বীকারও করেছেন। এর সঙ্গে তিনি তথ্যের জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণা, রাঁচি প্রভৃতির ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ারের। কুমার সুরেশ সিং বা কে. এস. সিং-এর *Dust-storm and Hanging Mist* বইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরোয় *Birsa Munda and his Movement 1874-1901* নামে। এই গ্রন্থে কে. এস. সিং লিখছেন- "My book on Birsa Munda and his movement was published in 1966 under a somewhat obscure title, *Dust-Strom and Hanging*

Mist : Story of Birsa Munda and his Movement. It was well received, and it stimulated wide ranging research and literary efforts on the theme not only in Mundari and Nagpuria in Chotanagpur but also in Hindi and Bengali. Mahasveta Devi based her novel, *Aranyer Adhikar* (1978) on my work. The novel won the Sahitya Akademi Award in 1979 and was translated into Hindi."[৪৬] "খুটকাট্টি" হল মুণ্ডা সমাজের এক বিশেষ ভূমিব্যবস্থা, যেখানে কোনো গ্রামে মুণ্ডাসংখ্যা বেড়ে গেলে, চাষের জমি, জলাশয়ের প্রয়োজনে গ্রামের প্রধান অন্য একটি জায়গা চিহ্নিত করে আসতেন, সেখানেই গড়ে উঠত মুণ্ডাদের নতুন গ্রাম। এই নতুন মুণ্ডা গ্রামের পত্তনের জন্য তাদের কারোর অনুমতির প্রয়োজন হয়নি কখনও। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় তাদের এই প্রথা বিপন্ন হয়ে পড়ে। জমি, জঙ্গল, পাহাড়ের ওপর জন্মগত অধিকার চলে যায়। উপন্যাসে ধানি মুণ্ডা বলে- "...বিরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর পত্তন করে। কিন্তু রাজা হল অন্যে। সে হতে আমাদের মাটিতে জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশে মানুষ।"[৪৭] কে. এস. সিং লিখছেন- "CENTURIES AGO, the ancestors of Birsa, who belonged to the Purti clan, in the course of their wanderings in search of a homeland for themselves, came upon a river called Domdagara in the vicinity of Chutia, a suburb of modern Ranchi....The land where they landed and settled down was called Chutia and their branch of Purti clan Chutia Purti. The leaders who led them to their new homeland were two brothers, Chutu Haram and Nagu. A sub-clan with its legends and history grew up around the episode. Subsequently, Chutu was

corrupted into Chutia, and later still into Chota, and Nagu into Nag."[৪৮] একে একে গড়ে উঠেছিল উলিহাতু, চালকাড়, তিলমা, আয়ুভাতু, তামার গ্রাম। ছোটোনাগপুরের রাজার ভাই হরনাথ সাহি মুণ্ডা ও মান্‌কিদের অধিকার খর্ব করে খুটকাট্টি গ্রামগুলো দিয়ে দিয়েছিল ঠিকাদারদের। ভেঙে গেছিল মুণ্ডাদের প্রাচীন গ্রামব্যবস্থা। বাইরে থেকে আসা মহাজন, ঠিকাদার, আড়কাঠিরা মুণ্ডাদের স্বাধীন জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল "বেঠবেগারি"। জমির অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই করেও সুফল পায়নি মুণ্ডারা। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের মুণ্ডাদের "খুটকাট্টি প্রথা" সম্পর্কে ধারণার অভাব, অন্যদিকে বিচারকরা মুণ্ডারি বোঝেন না; ফলে দোভাষী ও উকিল যা বোঝাত, তাই শুনেই রায় দিতেন। ঔপন্যাসিক আদালতে গিয়েও বেচানের নিঃস্ব হওয়ার কাহিনি শুনিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। বিরসার পিতা সুগানা মুণ্ডা নিজ খুট্টিগ্রাম উলিহাতুতে জমি রাখতে পারেনি, খেতমজুরের কাজে চলে এসেছিল বাম্‌বা। জঙ্গলের কোল ঘেঁষে ঘর বানিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও মহাজন তাদের উচ্ছেদ করল। এই বাম্‌দাতেই জন্ম হয় বিরসার। বৃহস্পতিবারে জন্ম, তাই বিরসা। অবশ্য তার আগেই উলিহাতুতে দাদা কোমতা ও দুই দিদির জন্ম হয়। বাম্‌দা থেকে উৎখাত হয়ে তারা আসে চালকাড়ে। চালকাড়ের প্রধান বীরসিং মুণ্ডা তাদের থাকার জমি দিয়েছিল। বিরসার জন্মস্থান উলিহাতু নাকি বাম্‌দা– এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও কে. এস. সিং উলিহাতুকে বিরসার পিতা সুগানা মুণ্ডার জন্মস্থান এবং বাম্‌দাতেই বিরসা জন্মেছেন বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিরসার জন্মসাল নিয়ে লিখেছেন- "Thus, the year 1874 might rightly be regarded as the year of his birth. Thursday was the day on which he was born, and he was named after the day of his birth according to the Munda custom."[৪৯]

সুগানা মুণ্ডা বাম্‌দা ছাড়ার আগেই সপরিবারে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। জার্মান মিশনের প্রচারক সুগানার নাম হয় মুসিদাদ, বিরসার নাম হয় দাউদ মুণ্ডা বা দাউদ বিরসা। মুণ্ডা সংস্কৃতিকে বেশিমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল খ্রিস্টধর্ম। মিশনারিদের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত জায়গায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার চালাচ্ছিল ইউরোপ। খেতে না পাওয়া, দুর্ভিক্ষ-খরা কবলিত মানুষগুলো মিশনে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, কারণ মিশন খেতে দেয়। জার্মান মিশনারিরা রাঁচিতে আসেন ১৮৪৫ সালের মার্চে। ১৮৫১ সালের ২৬শে অক্টোবর প্রথম একজন মুণ্ডা ধর্মান্তরিত হয়। ১৮৬৮ সালে জার্মান ব্যাপ্টিস্ট মিশনে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১১০৮। কে এস সিং লিখছেন- "In the depths of the jungles, in the Munda area, outposts were established at Burju (1869), Govindpur (1870), and Amlesha (1901). On the periphery of Munda land the Chaibasa mission was the first to be started in 1865 followed by Chakradharpur in 1893...By 1895, there were thirteen stations and 40,000 baptized Christians."[৫০] এই অঞ্চলে রোমান ক্যাথেলিক মিশন সর্বশেষে পদার্পণ করলেও সবচেয়ে বেশি ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল তারা– "From 15,000 converts in 1887, their number went up to 39,567 in 1897 and 71,270 in 1900."[৫১]

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের পাতা থেকে বিরসাকে তুলে এনে চরিত্রের সাহিত্যিক নির্মাণ ঘটিয়েছেন। ভবিষ্যতের মুণ্ডা নায়ককে সাধারণ মুণ্ডাদের থেকে পৃথক করে তৈরি করেছিলেন। *হুলমাহা* উপন্যাসের সিদুকে নায়কোচিত পৃথক করে চিহ্নিত করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সিদুর মায়ের মুখে আরোপ করেছিলেন এমন সংলাপ- "কাঁঠালবিচি পোড়া ও খুদজাউ খায় সিদু একটি কাঠের খোরা ভরে। মা সগর্বে চেয়ে থাকে। চার ছেলের মা হয় সে, এক ছেলে নিয়ে এমন গর্ব মনে আসে কেন? চারটে

ছেলেই যেন উদ্ধত শালের কোঁড়া। সিদু যেন সবচেয়ে তেজি। সিদুর যেবার জন্ম হল, গ্রামপ্রান্তে বোবা শিমুল গাছটায় সেবার ফুল ধরেছিল, আর কালো গাইটা, দুষ্টু বজ্জাতটা, তার আগে সাত দিন নিখোঁজ। সবাই জানে সে বনে গেছে, বাঘে নিয়েছে তাকে। ওমা! সিদুর জন্ম হল আর সে গাই শিঙে লতাপাতা জড়িয়ে 'হাম্বা হাম্বা' করে এসে হাজির। দেবদেবতার আশীর্বাদ ছাড়া এমনটা হতে পারে কি?"[৫২] সিদুর জন্মের সময়ের শুভ লক্ষণের মতো বিরসার জন্মের সময়ও আকাশে তিন তারার দুর্লভ সুলক্ষণ দেখেছিল মুণ্ডারা। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় ভাতের গন্ধ-স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। "দিকু"দের মতো ভাত ও আলোনা ঘাটো থেকে মুক্তি পেতে নুনের আকাঙ্ক্ষাই তাকে আর পাঁচটা মুণ্ডাদের মতো না থেকে লেখাপড়া করার তাগিদ জোগায়। উপন্যাসে পিতা সুগানা ও মা করমির মুখে বিরসার অন্যান্য মুণ্ডাদের থেকে পৃথক হওয়ার খবর শোনান ঔপন্যাসিক। পাঁচ সন্তানের মা হয়েও বিরসার প্রতি বেশি স্নেহ দুর্বল করমির কখনও মনে হয়- "ও কোম্‌তার মতো নয়, কোন্ মুণ্ডারী ছেলের মতো নয়, ও কেমন ছেলা?"[৫৩] সুগানার মনে হয় জঙ্গল তার সব রহস্য, সব ঐশ্বর্য বিরসাকে যেন বলে দিয়েছে। তারও মনে হয় বিরসা যেন অন্যরকম। পিতার মন অজানা আশঙ্কায় কামনা করে- "বিরসা তুই সবার মতো হ। সে সবার মতো হয়, যে ছেলেটা বাপের মায়ের কোল জুড়ে থাকে। রোগাভোগা, এ বছর আকাল হলে ক্রিশ্চান হয় মিশনে গিয়ে। আবার ফসল হলে পড়ে স্বধর্মে ফিরে আসে। তুই তাদের মতো হ বিরসা।"[৫৪] ইতিহাসে পাই- "Birsa's early years were spent with his parents at chalkad. His early life could not have been very different from that of an average Munda child."[৫৫] উপন্যাসের বিরসা টুইলা বাজিয়ে নামিয়ে এনেছিল বেনেবউ, বিরসার বাঁশি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ত বনের প্রাণী থেকে মুণ্ডা নরনারী-সকলে। মুণ্ডারা বিশ্বাস করে, তাদের আদি পিতা হর্‌ম আসুল বাঁশি শুনতে ভালোবাসেন বলে তার

প্রিয় কোনো কোনো সন্তানের আঙুল ও ঠোঁটে আশীর্বাদ ঢেলে দেন জন্মকালে। বিরসা হর্‌ম আসুলের তেমনই এক সন্তান- “When he grew up, he shared an interest in playing the flute, in which he became adept, and so movingly did he play that all living beings came out to listen to him. He went round with the *tuila*, the one-stringed instrument made from the pumpkin, in the hand and the flute strung to his waist.”[৫৬]

মহাশ্বেতা দেবী বিরসার মধ্যে দেখিয়েছেন এক ধরনের অস্থিরতা। আট বছর বয়সে মামার সঙ্গে সে চলে আসে দাদু দিবাই মুণ্ডার বাড়ি আয়ুভাতুতে। সেখানে মাসি জোনীর ভালোবাসায় থেকে সাল্‌গায় জয়পাল নাগের পাঠশালায় ভর্তি হয় সে। সেখানেই অক্ষরের প্রাথমিক ধারণা লাভ করে বিরসা। আয়ুভাতুতে বছর দুই থাকার পর মাসি জোনীর বিয়ে হয় এবং মাসির সঙ্গেই সে চলে যায় খাটাংগা। সেখানে অবস্থাপন্ন মেসোর জমিতে গাইচরা হয়ে, দু’বেলা খেয়ে, মাসির স্নেহের আশ্রয়ে থেকেও বিরসা হাঁপিয়ে উঠেছিল। জঙ্গলে কাদার মধ্যে আটকে থাকা সম্বরের মতো নিজেকে বিপন্ন মনে হয়েছিল তার। চারপাশের মুক্ত বৃহৎ জীবনের হাতছানির সত্ত্বেও খাটাংগার গাইচরার জীবনে আবদ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হতে চলার অদৃষ্টে। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন এই ভয়ংকর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি চেয়েছিল বিরসা। গাইচরাতে গিয়ে সামান্য ভুলের অপরাধে মেসো বিরসাকে মারে, এই মারই বিরসাকে আবদ্ধতা থেকে মুক্তির সুযোগ এনে দেয় – “He left the village and went to his brother at Kundi Bartoli, and stayed with him for some time. From there he probably went to the German mission at Burju where he passed the lower primary examination.”[৫৭] দাদা কোমতার মতো বিয়ে করে, ঘর-সংসার করে, আর পাঁচজন

মুণ্ডার মতো জীবন কাটাতে পারত বিরসা। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল ভাগ্য ওকে বাইরে টানছে, অন্তত মুণ্ডাদের ছা-পোষা কু-সংস্কারে ঘেরা সংকীর্ণ জগতের বাইরে। চেনা জীবনের বাইরের লেখাপড়ার জগৎ বিরসার মধ্যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। শেখার আনন্দ তার কাছে লক্ষ্যে তির বেঁধবার আনন্দের মতো। বুরজু মিশনে পড়াশোনা শেষ করে সে চলে আসে চাইবাসা মিশনে আরও লেখাপড়া শেখবার তাগিদে। যে পৃথিবী সুগানাদের কাছে তেকোনা, চালকাড়া থেকে বাম্‌দা, এক খুটকাট্টি গ্রাম থেকে আরেক খুটকাট্টি গ্রাম, দু'বেলা খাটো, মহুয়ার তেল, নুন আর মহাজনের হাত থেকে বাঁচার স্বপ্ন, সুগানা বুঝেছিল সেই পৃথিবী বিরসার নয়। বিরসার পৃথিবী তেকোনা নয়, মুণ্ডা পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে সে পৃথিবী বিশাল। বিরসার চাইকাড়া থেকে চাইবাসা পথ হাঁটা মহাশ্বেতা দেবীর অনুভবে বিরসার এক জীবন থেকে আরেক জীবনের পথে যাত্রা। সুগানার পক্ষে বিরসার এই অজানাকে জানার জন্য অস্থিরতা বোধগম্য হয় না, শুধু বোঝে চাষবাসে, ঘর-সংসারে স্থিতু হওয়ার জীবন বিরসার আকাঙ্ক্ষিত নয়। চাইবাসা মিশনে ভর্তি সহজ হয়নি বিরসার। মিশনে নতুন ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল। কিন্তু, ফিরতে নারাজ বিরসাকে ভর্তি নিতে হয়েছিল মিশনকে- "বিরসা বলল, 'আমি ফিরে যাব না। আমার পায়ে পাথর বেজে ঘা হয়েছে। আমি হাঁটতে পারব না।"[৫৮] দীর্ঘপথ খালি পায়ে হাঁটার ফলে "foot-sore"-এর তথ্য ইতিহাসনিষ্ঠ। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বিরসা চাইবাসা মিশনেই ছিল। এই চাইবাসা থেকে সর্দারদের মুল্‌কি লড়াইয়ের মূলক্ষেত্র ছিল কাছেই। ফলে সর্দারদের লড়াইয়ের কথা, লড়াইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এইসময়েই বিরসা মূলত অবগত হয়। দীর্ঘদিনধরে চিঠিপত্র, আর্জি-প্রতিবাদ করে চলতে থাকা সর্দারদের খুটকাট্টি জমি ফেরতের লড়াই এইসময়ই চরম আকার নেয়। বেশকিছু সর্দার ব্যাপটিস্ট মিশন ত্যাগ করে ক্যাথলিক মিশনে নাম লেখায়, জমির অধিকার ফিরে পেতে লড়াই করে, জেলে যায়। ডাক্তার নট্রট বিরসা বা

মিশনের অন্য মুণ্ডা বালকদের বুঝিয়েছিলেন "কিংডম অফ হেভেন"-এ বিশ্বাস ও খ্রিস্টধর্মের পালনই তাদের হারানো জমি ফিরিয়ে দেবে। "Birsa took it to heart. But he received a rude shock when the break with the missionaries came in 18866-7 and latter started calling the *Sardars* cheats."[৫৯] মিশনের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে বিরসার। মিশনের জীবন তাকে অন্যভাবে বাঁচা, ভাবার সুযোগ দিয়েছিল স্বীকার করেও সর্দারদের প্রতি অপবাদ তার মুণ্ডা অস্তিত্বে আঘাত করে। সর্দারদের ঠক, জোচ্চোর বলার প্রতিবাদে মিশন ত্যাগ করে বিরসা- "This was a turning point in his life; he exclaimed *saheb, saheb ek topi hai.*"[৬০] মিশন ত্যাগের পরপরই বিরসার পরিবার খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করে। ১৮৯০ সাল নাগাদ বন্দেগাঁও-এর জমিদার জগমোহন সিং-এর মুন্সি আনন্দ পাঁড়ের সংস্পর্শে আসে এবং বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। পইতে নেয়, চন্দন মাখে, তুলসি পূজা করে, রামায়ণ-মহাভারত পড়ে। মিশনের পড়াশোনা, খ্রিস্টান ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের জ্ঞান বিরসাকে সাহায্য করেছিল জাদু বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকা মুণ্ডাদের মুক্তি দিতে, পরিচ্ছন্নতার পাঠ দিতে।

১৮৭৮ সালের Indian Forest Act দ্বারা ইংরেজ সরকার সিংভূম, মানভূম, পালামৌর বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল নিজ অধীনে নিয়ে আসে। ১৮৯৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ সিংভূম অঞ্চলে এই আইন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়। ফলে, জঙ্গলের মধ্যেকার গ্রামগুলো তুলে দেওয়া হয়, জঙ্গল লাগোয়া চাষের জমি ও খাস জমিও চলে যায় বনদপ্তরের অধীনে। জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল আদিবাসীদের জঙ্গলের ওপর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়, যথা কাঠ কাটা, মধু আনা, শিকার নিষিদ্ধ হয়। সর্দারদের খুটকাট্টি গ্রামের অধিকার পুনঃদখলের লড়াইয়ের প্রতি দুর্বলতা ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এবং ধানী মুণ্ডার শত প্ররোচনা সত্ত্বেও বিরসা প্রত্যক্ষভাবে এতদিন এই লড়াইয়ে সামিল হয়নি। কিন্তু সরকার

অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিলে বিরসার মধ্যে আদিম মুণ্ডা পুরুষ জেগে ওঠে- "বিরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর রক্তে বসে টুটুয়া আর নাগু চেঁচিয়ে উঠেছিল। অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ-ভারতের কালো মানুষেরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।"[৬১] অরণ্যের ওপর বেঁচে থাকা আদিবাসী মানুষদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অর্থ অস্তিত্বের সংকট। অরণ্যের সঙ্গে বিরসার আবাল্য ভালোবাসার কথা, অরণ্যপ্রাণতার কথা ঔপন্যসিক বারবার তুলে ধরেছেন। ফলে, বিরসার মনে হয়েছিল দিকু ও সাহেবদের হাতে লাঞ্ছিত অরণ্য-জননী তার মুণ্ডা সন্তানের কাছে নিষ্কলঙ্ক হবার, শুচি হবার আর্জি জানাচ্ছে, সে আর্জি অশ্রুসিক্ত। স্পষ্টতই মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে মুণ্ডাদের জমি-জায়গার বিপন্নতার চেয়ে অরণ্যের বিপন্ন অধিকারকেই তুলে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন– "আমি অরণ্যের অধিকার চলে যাবার কথার ওপর জোর দিয়েছিলাম। জমি-ভূমির ওপর সেদিন তত জোর দিইনি।"[৬২] তাই অরণ্যের অধিকার ফিরে পেতেই বিরসা বিদ্রোহের পথ ধরে। ধর্মকে আশ্রয় করেই সে মুণ্ডাদের মনের মধ্যে লড়াইয়ের বীজ বপন করে। ধরতি-আবা হয়ে ওঠে সে। মিশনের শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিরসা ছিল তার সময় ও সমাজের চেয়ে অগ্রবর্তী। চিরকালই ধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশের সহজ মাধ্যম হয়েছে। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণবন্দিত মানবধর্ম থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের সিদু পর্যন্ত সকলেই ধর্মকে হাতিয়ার করেই আন্দোলনকে, প্রতিবাদকে গড়ে তুলেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে শোষিত, বঞ্চিত মুণ্ডাদের ভীরু হৃদয়ে, হীনমন্য ও অধীন মানসিকতায় মুণ্ডা হওয়ার গর্ব ফিরিয়ে আনতে না পারলে শক্তিমান বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে লড়াইটা করা যে সম্ভব নয়, বিরসা তা বুঝেছিল। মুণ্ডাদের মধ্যে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত উদ্ধারকর্তা ধরতি-আবার আবির্ভাব তাদের হারানো সাহস ফিরিয়ে এনেছিল। ফলে, "ধরতি-আবা conceptটি মুণ্ডারা তড়িৎগতিতে মেনে নেয়।"[৬৩]

মুণ্ডাদের ধর্ম ও সংস্কার থেকে জাদুবিদ্যা-ডাইনি বিদ্যায় ভয় ও বিশ্বাসকে মুক্ত করে বিরসা নিজের ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। সেই ধর্মের মূলমন্ত্রই ছিল শুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা। এই ধর্মে দীক্ষিত মুণ্ডারা বিরসাইত। বিরসার ধর্ম মুণ্ডাদের বিরসারাজ, মুণ্ডারাজ এনে দেবে, যে রাজত্বে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু থাকবে না। আদিম সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী বিরসা বুঝেছিল ব্যক্তিগত মালিকানা থেকেই সমাজে বৈষম্যের উৎপত্তি, আরও পুঁজি বাড়ানোর তাগিদ ও সেই তাগিদ থেকে শোষণ ও বঞ্চনার জন্ম – "আমার রাজে খেতে খেতে আল রবে না। সকল মাটি সকলের, সকল চাষ একসঙ্গে, সকল ফসল সকলের। যদি হাত তুলে দাও তবু মোর রাজে কোনো মুণ্ডা একা মালিক হবে না। মোর রাজে যুদ্ধ রইবে না। ধর্ম রাজ হবে। মোদের পিতা-পুরুষ যেমন ধর্ম মতে রাজ করাছে, মোর রাজে মোরা তেমনি রাজ করব। লাঠি হাতিয়ার দিয়ে রাজ চালাব না।"[৬৪] আদর্শ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাই বিরসাকে সময় ও সমাজের চেয়ে আধুনিক করে তুলেছিল। বিরসা শুধু দিকু, সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, সে মুণ্ডাদের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, জাদু-বিদ্যা, রক্তোৎসব ও হাজারও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল মুণ্ডা মন ও জীবনকে। বুঝেছিল, কুসংস্কার থেকে মুক্তিই মুণ্ডাকে সবরকম ভীরুতা থেকে উন্মুক্ত করে আধুনিক করে তুলবে, মুণ্ডা হিসেবে গর্ব অনুভব করবে আর সেই গর্বজাত আত্মবিশ্বাস লড়াইয়ের সাহস জোগাবে। শুধু তাই নয়, মুণ্ডা হিসেবে গর্বের অনুভব আনবে মুণ্ডারি ঐক্য। আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই ঐক্য আর সাহসের প্রয়োজন যে সবচেয়ে বেশি, বুঝতে ভুল হয়নি বিরসার। মদ্যপানে, উৎসব পালনে ও স্ত্রী-পুরুষের সহবাসে নিষেধাজ্ঞা মুণ্ডাদের লক্ষ্যে একমুখীন করার চেষ্টা। শুধু তাই নয়, এসব থেকে আসা ক্ষণিকের সুখ মানুষকে দুর্বল করে তোলে। যে কলেরা ও বসন্ত থেকে প্রতি বছর বহুসংখ্যায় মুণ্ডারা মারা যেত, সেই কলেরা ও বসন্তকে মহামারির রূপ নিতে দেয়নি বিরসা, এর পেছনে কাজ করেছিল

তার মিশনের শিক্ষা ও বৈষ্ণবীয় জ্ঞান। বসন্ত ও কলেরা সংক্রান্ত মুণ্ডাদের ধারণা বদলে দিতে পেরেছিল সে- "এখন একা পাথরের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে জল নাড়তে নাড়তে বিরসা ভাবে মুণ্ডাদের সে এখনও স্বাধীনতা দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের জীবন থেকে কতকগুলো নাগপাশ তো খুলে নিয়েছে। সেই অসুর পুজো, দেওঁরা ও পহানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, সহস্র সংস্কার, সে বন্ধনগুলো তো খুলে দিয়েছে।"[৬৫]

কিন্তু শুধুমাত্র এই সংস্কারগুলো যে তাকে ধরতি-আবা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে না, একথা বুঝেই সে পরবর্তীকালে আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। সর্দারদের এতদিনের ফলহীন আন্দোলন এইসময় বিরসার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। জমিদার-মহাজনদের হাত থেকে উদ্ধার করতে বিরসা প্রথমেই আদেশ দেয় এই জমিদার-মহাজনদের জমিতে চাষ না করতে, খাজনা না দিতে, সুদ না নিতে। সবচেয়ে কম মজুরিতে বা বিনা মজুরিতে মুণ্ডাদের শ্রমে ফুলেফেঁপে ওঠা সিস্টেমে এই সিদ্ধান্ত যে আঘাত করবে তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজ প্রশাসন নড়ে-চড়ে বসে- "The reports on Birsa's activities as a preacher sent to the government presented a vergue and even distorted picture. The Sub-Inspector of Police, Tamar, reported that a Mundari of Mauza Katwai, Tubil, had proclaimed that he had been sent by God, and by various juggling tricks had managed to attact a number of folllowers. He had forbidden people transplanting *dhan* saying that God would bring on the crops without their taking all that trouble, and taken up his quarters on the top of a hill, where a large number of people went to see him every day and brought him offerings goats, cloth etc."[৬৬] বিরসার অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার করেছিল সর্দাররা।

বিরসা যথার্থই মুণ্ডাদের বিশ্বাস অর্জন করে হয়ে উঠতে পেরেছিল তাদের ভগবান। জীবৎকালেই মুণ্ডাদের গানে স্থান করে নেয় সে। ৯ই আগস্ট, ১৮৯৫-এর বৃষ্টিমুখর অন্ধকার রাত্রে তামার পুলিশ স্টেশন থেকে দু'জন কনস্টেবল বিরসাকে গ্রেপ্তার করতে চালকাড়া পৌঁছেছিল। বিরসার তাদের বৃষ্টিতে ফিরতে দেয়নি, বরং থাকার ঘর দিয়েছিল। পলুস প্রচারককে আনিয়েছিল হেড কনস্টেবল। পলুস খ্রিস্টান প্রচারক হওয়া মুণ্ডা, তাই প্রশাসন ভেবেছিল বিরসা বা বাকি মুণ্ডাদের বোঝাতে সুবিধা হবে। কিন্তু ১৪ই আগস্ট পলুশ এবং ইউসুফ খান কনস্টেবল ফেরত যায়। পরবর্তী সময়ে রাঁচির ডেপুটি সুপার মীআর্স বিশাল পুলিশবাহিনি নিয়ে বিরসাকে গ্রেপ্তার করতে চালকাড়া পৌঁছায়। বিরসাকে গ্রেপ্তার করা হয়– "তামারের হেড কনস্টেব্‌ল আর কোচাং-এর বুড়া মুণ্ডা বিরসা আর বীর-সাইতদের নামে নালিশ দাখিল করে। বন্দগাঁওয়ে বসে মীআর্স সেই অভিযোগের তদন্ত করলেন। তাঁর তদন্তের ভিত্তিতেই কেস দাঁড় করানো হল।"[৬৭] শুধু তাই নয়, বিরসা, বিরসাইত ও সর্দারদের কার্যকলাপকে একসূত্রে বেঁধে গণ্ডগোল বাঁধাবার কেস তৈরি করা হয়। বিরসা যে ভগবান নয়, মুণ্ডাদের ধরতি–আবা নয়; বরং সাধারণ এক মুণ্ডামাত্র– এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাঁচির ডেপুটি কমিশনার চেয়েছিলেন মুণ্ডাদের সামনে বিরসার বিচার করতে। তাই তাকে রাঁচির জেল থেকে নিয়ে আসা হয় খুন্‌টিতে। ২৪শে অক্টোবর, বিরসার বিচারের দিন ডেপুটি কমিশনার দেখেন বৃহৎ সংখ্যায় মুণ্ডারা খুন্‌টিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। যদিও ডেপুটি কমিশনার চেয়েছিলেন মুণ্ডারা বিরসার বিচার দেখুক, কিন্তু বাস্তবে দেখেন তারা তাদের ভগবানকে, ধরতি-আবাকে দেখতে চায়, পুজো দিতে চায়। ভগবানকে দেখতে না পায় তো তার সঙ্গে জেলে থাকতে চায়। কমিশনারের হিসেব এলোমেলো হয়ে যায়। সেদিন যারা বিরসাকে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিল তারা ছিল সাদা পোশাকে ও নিরস্ত্র। শেষপর্যন্ত ১৮৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর আই.পি.সি সেকসান ৫০৫ ধারায় মুণ্ডাদের বিদ্রোহে

প্ররোচিত করার জন্য ২ বছরের কারাবাস এবং ৫০ টাকা জরিমানার রায় দিল এজলাস। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয়মাসের কারাদণ্ড। অন্যদের ২০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিনমাসের কারাবাস। পরবর্তী কালে বিরসার আড়াই বছরের কারাদণ্ড দুই বছর করা হয়। এই দু'বছরে বিরসার অপেক্ষা করেছিল মুণ্ডারা। ইংরেজ সরকারের শাস্তি ভগবান বিরসার ওপর মুণ্ডাদের আস্থাকে টলাতে পারেনি, মুণ্ডাদের মনে বিরসার ঈশ্বরত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। অথচ বিরসাকে পাগল প্রমাণ করতে, মুণ্ডাদের সামনে ঠক, প্রতারক একজন অতি সাধারণ মুণ্ডা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সরকার। কারণ "নিজেকে ঘিরে একটা আশ্চর্য ইন্দ্রজাল রচনা করা হয় তাঁর কৌশল, তার দায়। তাই তাঁর অতিনাটকীয় আত্মঘোষণা। একে পাগলামি ভাবাটা একটামাত্র উপরিতলকে দ্যাখ্যা শুধু, অনুগামীরা না বুঝলেও তাদের 'ভগবান' এটা বুঝেছিল। মুখে যাই বলুক, আর বুঝেছিলো ইংরেজ সরকার। না হলে তথাকথিত এই পাগলকে ধরার জন্য কেন তাদের এই রণসাজ, এই ষড়যন্ত্র, এই পাঁচশো টাকা বকশিস ঘোষণা, কেন এই দেশের লুম্পেন সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে গোপন রফা? এই প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধার সমবেত কারসাজি?"[৬৮]

১৮৯৭ সালের নভেম্বরে বিরসা মুক্তি পেলে বিদ্রোহের আগুন নব উদ্যমে জ্বলে ওঠে। যোগ্য নেতার মতোই সে সহযোদ্ধাদের লড়াইয়ের পথের বন্ধুরতা সম্বন্ধে সচেতন করেছে। শুধু বিরসাইত নয়, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া মুণ্ডাদেরও লড়াইয়ে সামিল করেছে। এবারই সে জমিদার-জোতদার-মহাজন-ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্পষ্টতই ডাক দিল "উলগুলানে"র। বিরসা মুণ্ডাদের মধ্যে প্রাচীন গর্ব ফিরিয়ে আনছিল। তাই শিকড়ের কাছে পৌঁছতে সে চুটিয়া, জগন্নাথপুর ও নওরতনগড় ছুঁয়ে এসেছিল- "Thus, the three temples in fact were built by the *kompat* Mundas, and these were subsequently forcibly occupied by the foreigners. The purpose of the visit

to these temples was to collect the old ancestral possessions, the *tulsi* leaves from Chutia, the sacred soil and water from the site of the old kingdom at Naw Rattan, the sandal paste from Jagarnathpur temple and to pay homage to the ancestors of the race at these places."[৬৯] এরপরেই বিরসা চালকাড়া ত্যাগ করে লড়াইয়ের ঘাঁটি হিসেবে নেয় বোর্তোদিকে। ডোমবারি পাহাড় ও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা বোর্তোদি বিদ্রোহীদের নিরাপদ ঘাঁটি হতে পারে ভেবেই বিরসার এই সিদ্ধান্ত। ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোমবারি পাহাড়ের নীচে জাগরী মুণ্ডার বাড়িতে লড়াইকেন্দ্রিক প্রথম সভা করে বিরসা। এরপরের সভা হয় সিম্‌বুয়া পাহাড়ে, হোলির দিন হোলির আগুন জ্বালিয়ে তারা সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের শপথ নেয়। হোলির গানে গানে তারা সশ্রদ্ধ স্মরণ করে মুণ্ডাদের দুই বীর দুখন সাই ও রোতন সাইকে। তারা ফিরে পেতে চায় মুণ্ডাদের প্রাচীন স্বর্ণসময়কে, সাহসকে। সহরাই পরবের আগে ডোমবারি পাহাড়ে পুনরায় সভাতে স্থির হয়, ২৪শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ঈভের দিনই উলগুলানের সূচনা হবে– "ডি সি ও সুপার যখন কথা বললেন, তখনি ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৯৯ সাল- বিরসা মুণ্ডাদের জানিয়ে দিল, উলগুলানের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আগুন জ্বালিয়ে তীর ছুঁড়ে ক্রিশ্চানদের ভয় দেখাতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হবে সশস্ত্র সংগ্রাম।"[৭০]

পূর্বপরিকল্পনা মতোই ক্রিসমাস ঈভের সন্ধ্যায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। সিংভূম জেলার চক্রধরপুর থানা এলাকা এবং রাঁচি জেলার খুন্‌টি, তামার, কাররা, তড়পা প্রভৃতি এলাকায় এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। খুন্‌টি হয়ে ওঠে বিদ্রোহের ভরকেন্দ্র। বড়দিনের উৎসবে যখন ইউরোপীয়রা মেতে তখনই এই প্রবল আঘাতটা করা হয়। খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে তামার, তড়পা, উলিহাতু প্রভৃতি জায়গায়- " In Tamar there were two cases of assault on the Christians. At

Ulihatu, Birsa's ancestral village, arrows flew into the village church. In Torpa, three arrows were shot at the Christians coming out of their houses on the evining of the twenty-fourth. At Marcha, John Pahan, the catechist, had a narrow escape. In Basia, arrows were fired into the German mission church, but no one was hit. On the evening of the twenty-fourth the same thing happened at Kajara. A Christian boy was shot with an arrow in the thigh at Ramtolia. In Ranchi one Chedi Mistry was shot with an arrow outside his shop near the German mission and died; one European servent was wounded slightly near the police Superintendent's residence."[৭১] এইপর্যায়ে তির নিক্ষেপ ও আগুন ধরানোর মতো একাধিক ঘটনা ঘটে। খ্রিস্টান মিশনারি ও সাহেবদের পাশাপাশি ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান মুণ্ডারাও বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হয়। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে এই অংশের প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বিরসাইতরা এইপর্বে শুধুমাত্র ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ২৪শে ডিসেম্বরের ঘটনাবলী মুণ্ডাদের মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিরসা আন্দোলনের পরিকল্পনানীতিতে পরিবর্তন আনে এবং খ্রিস্টান মুণ্ডাদের ওপর আক্রমণনীতির বদল করেন। মুণ্ডা খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত তাকে সমগ্র মুণ্ডাসমাজের সমর্থন লাভে সহায়তা করে। বিরসা সরকার এবং সাহেবকেই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের উৎখাতের লক্ষ্যেই আন্দোলনের অভিমুখ স্থির করে। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এবং সেনাবাহিনি হয়ে যায় আন্দোলনকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য। গয়া মুণ্ডার বাড়িতে পুলিশি আক্রমণ হয়, সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পাল্টা আক্রমণ চালায় গয়া,

তার স্ত্রী, ছেলে, ১৪ বছরের নাতি, দুই পুত্রবধূ, ও তিন মেয়ে। লড়াইয়ের এই রূপ ক্ষোভের স্বরূপকে প্রকাশ করে। খুন্‌টি থানায় আন্দোলনকারীরা আক্রমণ ও হত্যা চালানোর পর এই বিদ্রোহ দমন করতে তৎপর হয়ে ওঠে সরকার। সৈলরাকাব পাহাড়ে রক্তাক্ষয়ী লড়াইয়ে বহু মুণ্ডা মারা যায়। সরকার মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে নৃশংস দমন চালায়। বিরসাকে ধরার অপারেশন চলতে থাকে আর বিরসা হাঁটতে থাকে সৈলরাকাব থেকে বোর্তোদি, বোর্তোদি থেকে আয়ুভাতু, আয়ুভাতু থেকে মারাংহাড়া। জঙ্গল থেকে জঙ্গলে। ভগবানের নামে শাসকের বন্দুকের গুলি জল হয়ে যায়নি, বিরসা মুণ্ডাদের ভাতের স্বপ্ন, লবণের স্বপ্ন, খুটকাট্টি জমির স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু ভীরু বুকে সাহস দিতে পেরেছে। বিরসা ভরসা দিতে পেরেছে যেখানে বিরসা নেই, আসলে সেখানেও সে আছে, তাদের ভগবান আছে। ইতিহাসের বিরসা উপন্যাসের জ্যান্ত মানুষ হয়ে ওঠে যখন ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, তথ্যভারের মধ্যেও সাহিত্যিক তার অনুভূতির খবর পাঠককে দেন। মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছিলেন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান বিরসার পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব ছিল না আধুনিক শস্ত্রে সজ্জিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল কী হতে পারে- "কিন্তু বিরসা জানে, কুচিলা-তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা অনেক বেশি! কিন্তু বিরসা এও জানে, শুধু উন্নত হাতিয়ার নিয়ে সব যুদ্ধ জেতা যায় না। বিরসা জানে, হারজিত সফলতা ব্যর্থতা দিয়ে সব যুদ্ধের বিচার করা যায় না।"[৭২] কিছু যুদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য, টিকে থাকার জন্য, অত্যাচারিত মানুষের রক্ত-ঘামে অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকার জন্যও লড়তে হয়। শেষপর্যন্ত কয়েকজন মুণ্ডার বিরসার ওপর সরকারের ধার্য করা পাঁচশো টাকার লোভ আর পরমীর ভাতের লোভ ক্লান্ত ঘুমন্ত বিরসাকে ধরিয়ে দেয়। বিরসা জানত জেল থেকে, সরকারের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। তাই শোষিত ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বুকে এই আশ্বাসটুকু রেখে দিতে চায় যে তাদের উলগুলান ব্যর্থ হয়নি। তাদের ভগবান ফিরবে। ইংরেজ বিচারব্যবস্থার প্রতি

বিরসার ধারণাকে সত্যি করে ও মুণ্ডাদের হয়ে লড়া জেকবকে ব্যর্থ করে রাঁচির জেলে ৯ই জুন ১৯০০ তারিখে বিরসা মারা যায়। রিপোর্টে কলেরার উল্লেখ ছিল। বিরসার মৃত্যুকে ঔপন্যাসিক রহস্যে ও সত্যাসত্যে আচ্ছন্ন রাখলেন উপন্যাসে- "সেদিন সুপার বলে দিল ওর কলেরা হয়েছে, ও বাঁচবে না। কলেরা শিবনরা অনেক দেখেছে। হায়জা, চেচক, সাপকাটা কতভাবে মৃত্যু ওদের টোলিতে ঘুরে ঘুরে প্রজা নিয়ে যায় যমপুরীতে দাস খাটাতে। ভেদ নেই, বমি নেই। এমন হায়জা বুঝি ভগবানেরই হয়।"[৭৩] অন্যত্র, বিরসা অমূল্যকে বলেছে- "আমার হায়জা হয় নাই, সেকথা সুপার সাহেব হতে কেও ভাল জানে না। বুঝ না, মোরে জীয়ন্তে বারাতে দিবে না?"[৭৪] বিরসার মৃত্যুর পর নির্জন সন্ধ্যায় তার দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। দেহ পুড়িয়ে ফেলা আসলে দুটো উদ্দেশ্যকে সফল করবে বলে ভেবেছিলেন জেলের সুপার- ১। বিরসা যে ভগবান নয়, রক্তমাংসের মানুষ ছিল, মুণ্ডাদের কাছে তা প্রমাণ করা যাবে এবং ২। বিরসার দেহের পুনরায় ময়নাতদন্তের দাবি করতে পারবে না ব্যারিস্টার জেকব। শেষোক্ত উদ্দেশ্য বিরসার মৃত্যুকেন্দ্রিক রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। মহাশ্বেতা দেবী এইস্থানে লিখেছিলেন- "সুপার মনে মনে সব রিহার্সল দিয়ে নিলেন। মৃত্যুর কারণ বলতে হবে কলেরা। পোস্টমর্টেম করতে হবে বিকেলে। সন্ধ্যার পর লাশ জ্বালিয়ে দিতে হবে। "পোস্টমর্টেমে লিখতে হবে, বিরসার বুক ওঠা-নামা দেখতে দেখতে ভেবে নিলেন সুপার লিখতে হবে 'পাকস্থলী জায়গায়-জায়গায় কুঁচকে দলা পাকিয়ে গিয়েছে, ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হয়ে গিয়েছে' ক্ষয় হতে হতে। বহু পরীক্ষাতেও পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ কলেরা।"[৭৫]

উপন্যাসজুড়ে দীর্ঘকালধরে শোষণ-বঞ্চনার কথা, বিরসার ভগবান হয়ে ওঠা ও বিদ্রোহের আয়োজনের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা প্রভৃতি অনুভূতি রূপায়ণের অবকাশ কম, তবুও সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের অনুভবকে স্বীকার করেই শুধু ইতিহাস হয়ে থাকার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায়।

উপন্যাসে ডোন্‌কার স্ত্রীর বিরসার প্রতি অনুভবের সামান্য আভাস দিয়েই ঔপন্যাসিক নীরব থেকেছেন। বিপরীতে, বিরসার মা করমি মাতৃহৃদয়ের বেদনা নিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন। করমি চায়নি বিরসা ভগবান হয়ে উঠুক। আর পাঁচজন মায়ের মতোই সে চেয়েছিল বিরসা স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঘর-সংসার করুক- "কর্‌মির মনে হল, ওর জন্মের পর চব্বিশটি, 'হোলি'ও যায়নি। এখনি বিরসা, ওর বাপ-ঠাকুর্দা পরদাদা বয়সী যে-সকল মুণ্ডা তাদের চেয়েও যেন বৃদ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, আমার জোয়ান ছেলে। নতুন আরান্দির বউ নিয়ে সংসার করবে, কিন্তু নিয়তি এমন যে, মুণ্ডাদের সকল দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অনাহারের বোঝা ও নিজের কাঁধে টেনে নিল।"[৭৬] কর্‌মি বুঝতে পারে না যখন ঘাটোর সঙ্গে নুন ছিল না অথচ সন্তানেরা কাছে ছিল তখনকার দুঃখ আজকে সবাই চেনে, মানে ভগবানের মা হিসেবে অথচ বিরসা নেই– এর দুঃখের চেয়ে বেশি না কম। কর্‌মির মনে হয় সে আড়কাঠি হয়ে যাওয়া, একেবারের জন্য চলে যাওয়া সন্তানের মায়েদের মতো পাথরে মা হয়ে যাবে। সন্তান হারানোর ভয়ে ভীত কর্‌মিই একমাত্র চায়নি বিরসা ধরতি-আবা হয়ে যাক। জেলফেরৎ বিরসাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকা কর্‌মির মাতৃ-হৃদয়ের আর্তির অনবদ্য চিত্রাঙ্কণ পাঠক পেল মহাশ্বেতা দেবীর কলমে- "কর্‌মি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কাল হতে তুই আবার সকলের হওয়া যাবি। মোরে তোর কাছকে যেতে দিবে না কেউ। আজ আমার কাছকে ঘুমা টুখানি। তোরে একবার বুকে ধরি।' বৃদ্ধা জরতী কর্‌মি পৃথিবী–দেবতাকে বুকে জাপটে শুয়ে রইল। বাইরে শীত, উত্তুরে বাতাস। কর্‌মির বোবা কান্নার মতো জঙ্গলটা বিলাপ করতে লাগল বাতাসের দাপটে।"[৭৭] মুণ্ডাদের উদ্ধারকর্তা বিরসার ভগবান হয়ে ওঠার পরেও তার মধ্যে সাধারণ মানবের আকাঙ্ক্ষা, না-পাওয়া জনিত হতাশাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ফুটিয়ে তুলে মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যের শর্ত পূরণ করেছিলেন- "দেখতে দেখতে বিরসার চোখ কুয়াশায় ঢেকে গেল। ভগবান হতে হলে অনেক বড়

দাম দিতে হয়। সে-জীবনে কোনো বরযাত্রা নেই, বাজনা বাজিয়ে মেয়েরা আমপাতায় জল ছিটিয়ে বরকে নামিয়ে নিয়ে 'চুমান্' স্ত্রী-আচার করে না। বিরসাকে তেল-হলুদে স্নান করিয়ে কোনো কনের বাপ কোলে বসায় না।"[৭৮]

বিরসার মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হয় না। ঔপন্যাসিক জুড়ে দেন পরিশিষ্ট। শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই, অধিকারের লড়াই মানুষের চিরকালীন বলেই ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে তা শেষ হয়ে যায় না। বিরসার মৃত্যুকে মুণ্ডারা বিশ্বাস করে না, তারা ভগবানের অপেক্ষা করে। বিরসার ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার মন্ত্র, শক্তিটা দিয়ে গেছে। এই পরিশিষ্ট অংশ ন্যায়পরায়ণ বলে গর্বিত ইংরেজদের বিচারব্যবস্থার কঙ্কালটা তুলে ধরে। বিরসাকে লেখিকা মিশিয়ে দেন প্রকৃতির সঙ্গে, কর্‌মি তাকে খুঁজে পায় নদী-গাছ-পাহাড়-মাটিতে। আর অপূর্ব, যার ডায়েরির পাতা এই পরিশিষ্ট- তার অনুভব আর উপলব্ধিতে আসলে মিশে থাকেন মহাশ্বেতা দেবী নিজে। আদিবাসীদের ওপর আজীবন শোষণের প্রতিবাদ করা লেখিকা অপূর্বর মুখে বসালেন তাঁরই বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি- "উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উলগুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ .....।

আমাকে শুনতে দাও। শুনতে না শিখলে আমি বিশ্বাস করব কেমন করে?"[৭৯]

ব্রিটিশ শাসনকালে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন করদ রাজ্য, যার অধিবাসীদের বেশিরভাগই ছিল পার্বত্য আদিবাসী। কাছাড়, লুসাই পাহাড় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে ঘেরা ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান কুকি, ত্রিপুরী, জামাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, হালাম প্রভৃতি। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতোই এই রাজ্যেও রাজাই ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে। রাষ্ট্রব্যবস্থার পিরামিডে প্রজাদরদি রাজা ছাড়া পিরামিডের

চূড়ায় অবস্থান করা রাজার সঙ্গে সাধারণ প্রজার সংযোগ তেমন তৈরি হয় না। সম্প্রদায়গত বা স্থানিক ক্ষোভের কারণ তাই রাজার পক্ষে দুর্বোধ্য থেকে যায়। ত্রিপুরায় কিছু অসৎ ক্ষমতালোভী রাজার নিকটব্যক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিয়াং ও জামাতিয়ারা বিদ্রোহ করছিলই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে জাপানের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণের গতিকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ শাসককে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। ত্রিপুরার সৈন্য দিয়ে চট্টগ্রামে গিয়ে ব্রিটিশশাসককে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুররাজ আদেশ দিয়েছিল পার্বত্য উপজাতিদের সৈন্যদলে যোগদান বাধ্যতামূলক। দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও বঞ্চনা তো ছিলই, ত্রিপুররাজের এই হুকুম রিয়াংদের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছিল। রতনমণি রিয়াং-এর নেতৃত্বে রিয়াংরা দীর্ঘদিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, আর এই আন্দোলনকে সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিকে বাঁধলেন শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর *রতনমণি, রিয়াং* (১৯৭৮) উপন্যাসে।

মনে রাখতে হবে, রিয়াং আন্দোলনের সময়কালেই ভারতজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার চলছে। আগস্ট আন্দোলনের সময়পর্বে দাঁড়িয়ে রতনমণি স্বাধীন রিয়াং রাজ্যের যে স্বপ্ন বুনেছিলেন তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বা ধারণা নয়, বরং সময়জাত। তাই, ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষ করেছেন এইভাবে- “একটি আন্দোলনকে ওরা এমনি করে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু সত্যকে কোনদিনই বিনাশ করা যায় না। রতনমণি নেই কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। উত্তরকালের মানুষ তাঁরই সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে পেয়েছে মহান একটি উত্তরাধিকার, স্বাধীনতার অধিকার। কোন মরণোত্তর তাম্রপত্রের স্বীকৃতি নাই বা থাকলো। তবু ত্রিপুরার নির্জন অরণ্য মর্মরে আজও ভেসে ওঠে কোন আদিবাসীর গান

জগনি গুরু সে-অব

মানিয়ে মুনুছে

রতনগুরু সে অব।”[৮০]

১৯৪৩ সালে সংঘটিত রিয়াং বিদ্রোহের নায়ক পার্বত্য চট্টগ্রামের রতনমণি নোয়াতিয়া। প্রাথমিকভাবে রতনমণির উদ্দেশ্য ছিল গরিব রিয়াংদের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা। তৎকালীন উদয়পুর থানার দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত নায়েব দারোগা দীনেশচন্দ্র দাশকে রতনমণির দেওয়া বিবৃতি থেকে জানা যায়- “আদিবাসীদের মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায় অত্যন্ত নিরীহ ও বোকা প্রকৃতির। ধর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এই জ্ঞান তাদের নেই। এই অবস্থা দেখে তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবান বা ধর্মজ্ঞান যাতে হয়, তার জন্য নামপ্রচার করতে আরম্ভ করেন।”[৮১] ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ রতনমণি ত্রিপুরায় আসেন। বাড়ি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার রামচীড়া গ্রামে। এই গ্রামে গিয়েই রতনমণির শিষ্যত্ব প্রথম গ্রহণ করেন খুশীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া। রতনমণি যে সাধু ও ধর্মীয়ভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। রতনমণির পিতা নীলকমল নোয়াতিয়াও ছিলেন সাধু প্রকৃতির। ত্রিপুরায় দুঃখ-দুর্দশাময় ধর্মভাবরহিত রিয়াংদের মধ্যে তিনি ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা খুশীকৃষ্ণের প্রতিভা ও উৎসাহ রতনমণিকে ত্রিপুরায় এসে রিয়াংদের মধ্যে ধর্মভাব গড়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছিল। রতনমণি প্রচারিত নামগানের সুরে মেতেছিল অনেক রিয়াং। এই নামগানের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল নতুন অস্তিত্বের আস্বাদ- “এতকাল এই অসহায় মানুষগুলো জানতো না যে মানুষের পরিচয়ে তারাও বাঁচতে পারে। শুধুমাত্র কষ্টেসৃষ্টে খেটেখুটে একবেলা ভাত-সুট্‌কি খেতে পাওয়া আর ছ্যাং খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে পড়ে জীবন কাটানো ছাড়া আর কিছুই জানতো না তারা। এখন তারা যেন নোতুন এক অস্তিত্বের স্বাদ পেয়েছে। তারাও মানুষের মত বাঁচতে চায়, তাদের মানবিক অধিকার কিছু আছে!”[৮২] লক্ষণীয়, ঔপন্যাসিক “তাদের মানবিক অধিকার কিছু আছে”র শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। মানুষের বাঁচার

অধিকার যেখানে সংশয়াদীর্ণ, সেখানে দুর্দশার পরিমাণটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তাই রতনমণি শুধুমাত্র তাদের মধ্যে হৃত গৌরবময় ঐতিহ্যকেই অনুভব করতে শেখাননি; হৃত মানুষের অধিকারকে পুনরাধিকারের পাঠও দিয়েছিলেন। নতুন চেতনায় উদ্দীপিত করাতে চেয়েছিলেন হতদরিদ্র, নির্যাতিত মানুষগুলোকে, যে চেতনায় বঞ্চিত, শোষণক্লান্ত মানুষ ফিরে পেতে পারে জীবনের আশ্বাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এই উত্তরণের আশ্বাসের পটভূমি নির্মাণ করলেন এইভাবে- "...আবছা সন্ধ্যার অন্ধকারে হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ওই মহান মন্ত্রধ্বনি, বিশ্বাসহারা অসহায় অত্যাচারিত মানুষের দল আজ যেন সারা মনপ্রাণ দিয়ে একটি কালাতীত যুগাতীত মহাশক্তির স্মরণ নিতে চায়। ওরা ফিরে পেতে চায় জীবনের আশ্বাস-শোকের সান্ত্বনা, হৃদয়ের উৎস থেকে উৎসারিত কোন অমেয় শক্তিকে। তাই এই আত্মনিবেদনের মন্ত্র ধ্বনিত হয় ওদের কণ্ঠে অরণ্যের আদিম অন্ধকারে।"[৮৩] রতনমণি শুধুমাত্র রিয়াংদের মধ্যে ধর্মচেতনাকেই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি, বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কুসংস্কার ও মদ্যপানে আসক্তি দূর করার মতো সামাজিক এবং খাদ্যসংকটে আশ্রমে গণভোজনের ব্যবস্থা করার মতো জনহিতৈষী কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। খগেন রিয়াং ও অন্যান্য চৌধুরীদের সাধারণ গরিব রিয়াংদের প্রতি দীর্ঘদিনধরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত রিয়াংদের মধ্যে প্রতিবাদের স্বরও তিনিই জাগিয়ে তুলেছিলেন।

যে কোনো বিদ্রোহের পেছনে সক্রিয় থাকে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, অত্যাচার ও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা। রিয়াং আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এই আদিবাসী বিদ্রোহের নেপথ্যে ছিল স্বজাতির মুষ্টিমেয় মানুষের ক্ষমতার আস্ফালন এবং আরও ক্ষমতা কায়েম করার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। রিয়াং সর্দার খগেন চৌধুরী ও তার অনুচরদের গরিব রিয়াংদের ওপর অত্যাচারই তৈরি করেছিল বিদ্রোহের পটভূমি। বহুটিলা আর তার নীচেকার বহু উর্বরা জমির মালিক ছিল খগেন চৌধুরী। তার

প্রাসাদোপম দোমহলা বাড়ি, হাতির দাঁত ও হরিণের সিং দিয়ে সাজানো সেই বাড়ির দেওয়াল, ফরাস পাতা মেঝে আর দেশি ছ্যাং-এর বদলে বিদেশি মদে পরিপূর্ণ ভাঁড়ার খগেন চৌধুরীকে স্বসমাজধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছিল। আরও অর্থপ্রতিষ্ঠা ও রিয়াংদের ওপর একচ্ছত্র কায়েমি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল ত্রিপুরার রাজার শীলমোহর পাওয়া "রায়কাঞ্চন" পদটার। "রায়কাঞ্চন" পদের যে মর্যাদা তা হল, "রিয়াং সমাজের প্রতিষ্ঠা বহুকালের। পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অবধি ছিল তাদের রাজ্য, সেই রাজ্যে রাজা একজন থাকতেন কিন্তু সেই রাজা নির্বাচন হোত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সমাজের সকলের মত নিয়ে তার নির্বাচন হোত। সেই রাজত্ব চলে গেছে, আজ তারা বনে পাহাড়ে বাস করে, অনেক কিছু হারিয়ে গেছে তাদের। তবু আজও তারা মানে তাদের সমাজের রায়কাঞ্চনকে। রাজার মতই মান্য করে।"[৮৪] এই রায়কাঞ্চন পদাধিকারী ব্যক্তিই রিয়াং সমাজের প্রধান। তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শই রিয়াংদের কাছে প্রধান ও শেষকথা। রিয়াং এলাকা ত্রিপুররাজের অধীনে আসার আগে থেকে, প্রায় চারশো বছর ধরে এই প্রথা রিয়াং সমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে রিয়াং সমাজ মনোনীত "রায়কাঞ্চন"এর ওপর পড়ত ত্রিপুররাজের অনুমতির শীলমোহর। ফলে, বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভই আকর্ষণ করেছিল খগেন চৌধুরীকে রায়কাঞ্চন পদটার প্রতি। অথচ একজন রায়কাঞ্চন বেঁচে থাকতে অন্য কোনো রিয়াং যে রায়কাঞ্চন হতে পারে না- প্রথার এইদিকটি খগেন চৌধুরীর অজানিত ছিল, এমন নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই খগেন রিয়াং-এর মানসিকতা ও ভাবনার বৃত্তটি পাঠকের কাছে মেলে ধরেছেন এইভাবে- "আমানিয়া ওঝাইর মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে খগেন্দ্র রিয়াং পিতার প্রভাব প্রতিপত্তি আর ধনসম্পদের উত্তরাধিকারের সাথে সাথে নিজেও রিয়াং সম্প্রদায়ের স্থানীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। যদিও 'চৌধুরী' পদ বা পদবী কোনটাই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জনের কোনও সুযোগ

ছিল না, তবে পিতার প্রভাব প্রতিপত্তি, অগাধ ধনসম্পদ, রাজদরবারের অনেকের সাথে পিতার হৃদ্যতা, সবকিছুই খগেন্দ্র রিয়াং-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে...নিজেকে ত্রিপুরার রিয়াং সম্প্রদায়ের 'রায়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে থাকে।...ক্রমেই তার এমন বিশ্বাস জন্মায় যে রিয়াং সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা ভেঙে তার পক্ষে রিয়াংদের 'রায়' বা রাজা হওয়া তেমন অসম্ভব কিছু নয়।"[৮৫] এই অংশের মধ্যে দিয়ে এই চরিত্রটি সম্পর্কে, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠক সম্যক ধারণা করে নিতে পারে। ১৯৩৫ সালে পূর্বতন "রায়কাঞ্চন" নাতী রায় মারা গেলে গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ রিয়াং স্থির করেছিল দেবী সিংহ হবে পরবর্তী "রায়কাঞ্চন"। কিন্তু এই প্রস্তাবে ত্রিপুররাজের স্বীকৃতির শীলমোহর পেতে দেরি হচ্ছিল, কারণ খগেন চৌধুরীর চক্রান্ত। অন্যদিকে, দেবী সিংহ সাধারণ রিয়াংদের সমর্থনের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। সাধারণ গরিব রিয়াংদের ওপর আর্থিক নির্যাতন চালায় খগেন চৌধুরী। গঙ্গাপূজার চাঁদা, বাসী পূজার চাঁদা দু'টাকা থেকে বাড়িয়ে ঘরপ্রতি চার টাকা করা হয়। চৌকিদারী কর চার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয় নয় টাকা। "রায়কাঞ্চন" হতে মরিয়া নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে রাজদরবারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য।

টিলার ওপর রিয়াংরা "জুম" চাষ করত। সাধারণ রিয়াংদের উর্বর জমিতে দৃষ্টি পড়ে খগেন রায় ও তার অনুগামীদের। তাকে "রায়কাঞ্চন" হিসেবে মেনে নিতে নারাজ শক্তি রায়ের উর্বরা জমি মিথ্যে অনাদায়ি কর-এ অমরপুর থেকে নির্দেশ এনে দখল করে নেয় খগেন রায় ঘনিষ্ঠ তীর্থহরি চৌধুরী। নিজের জমি হারিয়ে এখন অন্যের জমিতে জুম খাটে শক্তি রিয়াং। নিঃস্ব শক্তি রায় হয়ে ওঠে প্রতিবাদে কঠিন। চৌকিদারী করের অন্যায় বৃদ্ধির প্রতিবাদে গর্জে ওঠে সে। অবশ্য সেই প্রতিবাদের স্বররোধের পন্থা ক্ষমতাসীনের দলের নৃশংসতার স্বরূপ বহন করে। খগেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে

প্রতিবাদের শাস্তিতে শক্তি রায়ের ঘর পোড়ে- "শক্তিরায় চুপ করে চেয়ে দেখছে তার পোড়া ঘরখানার দিকে। বাঁশের খুঁটি জাফারি মুলিবাঁশের বেড়ার সুন্দর নিকোনো ছোট একটি ঘর ওদের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ওই আগুনের গনগনে আংরার তাপ তার সারা মনে।"[৮৬] বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, এই আগুনের তাপই রূপান্তরিত হয়েছিল বিদ্রোহের আগুনে। খগেন রায় ও তার অনুগামীদের অত্যাচার এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। রাজশক্তি প্রবর্তিত ঘরচুক্তি বা ঘরকর ও তিতুন প্রথাও রিয়াংদের মনে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। যেহেতু ত্রিপুরার অরণ্যঘেরা পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে জমি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা চালু ছিল না এবং জুম চাষের জন্য সুনির্দিষ্ট মালিকানাস্বত্ব ছিল না, তাই ১৯১৯ সালে ত্রিপুরার রাজা ঘরচুক্তি চালু করেন। এই ঘরচুক্তির নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ছিল বিভিন্নরকম। ত্রিপুরী, জামাতিয়া, কুকিদের থেকে বেশি ঘরচুক্তি দিতে হত রিয়াংদের। এই বৈষম্য ও পরবর্তীকালে ঘরচুক্তির অর্থবৃদ্ধি রিয়াংদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। "তিতুন প্রথা" ছিল রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী বা সেনাবাহিনি একস্থান থেকে অন্যত্র গমন করলে তাদের মালপত্র, খাদ্যদ্রব্য বিনাপারিশ্রমিকে পৌঁছে দিতে হত আদিবাসীদের। রাজশক্তি প্রবর্তিত এই ব্যবস্থাই ছিল "তিতুন প্রথা'। অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খানিক শিথিল হলেও রিয়াংদের ওপর এই জুলুম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। খগেন রায় ও তার ঘনিষ্ঠ অন্যান্য চৌধুরীরা এই প্রথার ব্যবহার করে ব্যক্তিগতস্তরে সাধারণ গরিব রিয়াংদের দিয়ে বেগার খাটতে বাধ্য করত।

রতনমণি দেখেন গরিব রিয়াং বস্তিতে মহামারি লাগে। ভেদবমি হয়ে মারা যায় কয়েকজন। অথচ ওদের মৃত্যুর খবর পৌঁছোয় না উদয়পুরের সদর দপ্তরে। সরকারি খাতায় গরিব রিয়াংদের মৃত্যুর হিসেব পর্যন্ত না ওঠা রিয়াংদের প্রতি সরকারের বঞ্চনা, অবজ্ঞা ও উদাসীনতাকেই নির্দেশ করে।

যেখানে মানুষের মৃত্যুর খবর পর্যন্ত রাখা হয় না, আসলে সেখানে মৃত্যুর মুখ থেকে মানুষকে বাঁচানোর তাগিদও থাকে না। জীবনের দাম সেখানে নেই বললেই চলে। খগেন চৌধুরীদের কাছে সাধারণ গরিব রিয়াংদের জীবনের মূল্য বোঝাতে ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে মহারাজের হাতিখেদানো কাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। নামমাত্র খোরাকি আর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে খগেন চৌধুরীরা তাদের বুনো মত্ত হাতির মুখে, অবশ্যম্ভাবী বিপদের মুখে ঠেলে দেয়- "কঠিন বিপদের কাজ। বনের গভীরে দল বেঁধে থাকে বুনো হাতিগুলো, যেন ছোটখাটো কালো পাহাড় এক একটা। টিনের শব্দ, টিকরার আওয়াজ করে তাদের তাড়াতে হয় সেই বুনো হাতির পালকে, মশালের আগুন জ্বলে, পটকার আওয়াজে বন পাহাড় কেঁপে ওঠে। আর সব ছাপিয়ে ওঠে ওই বিতাড়িত হাতিগুলোর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।"[৮৭] সর্বজয় রিয়াং প্রত্যক্ষ করেছে সেই মত্ত হাতির তাণ্ডব। তৈন্দুলের বাবা মারা যায় হাতির তাণ্ডবেই। শুঁড়ে করে তুলে আছাড় মেরে সব আর্তনাদকে স্তব্ধতায় রূপান্তরিত করে হাতিটা তৈন্দুলের বাবাকে নিথর করে তোলে। এটাকে নিছক দুর্ঘটনা ভাবা যেতে পারত; কিন্তু এই দুর্ঘটনা শোষণের নামান্তর হয়ে ওঠে যখন মৃত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি নয়, পরবর্তীকালের জন্য আশ্বাস নয়, খগেন চৌধুরীর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ। রিয়াংরা উপলব্ধি করে- "ওদের মৃত্যুর কোন দামই নেই। ওদের লোকসানই বড়কথা।... ওই খগেন রায়ই রাজা মহারাজাদের হাতি খেদার জন্য বেগার ধরে নিয়ে যায়, আর তাদের প্রাণের দাম খগেন রায়দের কাছে কানাকড়িও নয়।"[৮৮]এমন উপলব্ধিসঞ্জাত ক্ষোভই পরবর্তীকালে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। পরেরবছর তৈন্দুল রিয়াংরা হাতিখেদার কাজে যেতে অস্বীকার করে।

১৯৪৩ সালে রিয়াং বিদ্রোহের সময়কাল নাগাদ ভারত ও ইউরোপজুড়ে ছিল এক ভয়ংকর অস্থির সময়। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে '৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন ও

নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনির কার্যকলাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ত্রিপুরা হয়ে উঠেছিল ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের প্রধান রণাঙ্গণ ঘাঁটি। এই যুদ্ধচলাকালীন জাপান বার্মা বা ব্রহ্মদেশ অধিকার করে ব্রিটিশশাসিত ভারত দখল করতে উদ্যত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই সংকটমুহূর্তে দেশীয় করদ রাজ্য ত্রিপুরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জাপানকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনিকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু ত্রিপুরার সৈন্য বাহিনির শক্তি তেমন বেশি না হওয়ায় শুরু হয় আদিবাসী যুবকদের দিয়ে সৈন্যবাহিনি গড়ে তোলার কাজ। আর এই কাজে আদিবাসী যুবক সংগ্রহের মূল দায়িত্ব পড়ে খগেন রায়ের ওপর। অত্যাচারী ও ধূর্ত খগেন রায় এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। সে বুঝেছিল এই পথেই সে ‘‘রায়কাঞ্চন’’ হওয়ার রাজার শীলমোহর আদায় করে নিতে পারবে। বসতিতে বসতিতে খগেন রায় নিতাই রিয়াংদের মতো জোয়ানদের খোঁজে, যাদের কাছে যুদ্ধের চাকরির নেশা ছ্যাং-এর নেশার চেয়েও তীব্র, জঙ্গলের অন্ধকার ঝুপড়িতে থেকে যারা শহরের টানকে অস্বীকার করতে পারেনি। অন্যান্য কারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তির আদিবাসীদের সেনাবাহিনিতে যোগদানের নির্দেশ রিয়াংদের এতদিনের সঞ্চিত ক্ষোভে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রতিবাদে সরব হয় তারা। কান্ত রায়, তাইন্দা রিয়াং প্রমুখ অভিজ্ঞ মাতব্বররা এই যোগদানের বিরোধিতা করে। সৈন্যসংগ্রহের সরকারি দায়িত্ব খগেন রায়ের ক্ষমতার স্পর্ধা সীমাহীন করে তোলে। অত্যাচার রিয়াংদের ওপর আর্থিক শোষণ ও দৈহিক নির্যাতনকে অতিক্রম করে নারীদেহ লোলুপতার চরমতায় পৌঁছায়। খগেন রায়ের অনুচর মৈতুল নয়ন্তীকে ভোগ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালিপ্রসাদ নিতাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে পৈরীকে এনে তোলে নিজের বাগানবাড়িতে। নয়ন্তী, পৈরী ও আরও অনেক রিয়াং মেয়েদের নিজেদের লালসার শিকার করতে চায় খগেন রায়ের অনুচর ও ঘনিষ্ঠেরা-

“খগেন রায় তাই সন্ধ্যার পর দলবল নিয়ে বসেছে। কালিপ্রসাদ দলবল নিয়ে গেছে, ওরা কোন কোনদিন আনে কোনও বসতি থেকে নিরীহ মেয়েদের ধরে, রাতভোর চলে হুল্লোড়।”[৮৯]

নারীসম্মানের ওপর আঘাত নেমে আসতেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে গরিব রিয়াংরা। তারা খগেন রায়দের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। তাদের মনোনীত “রায়কাঞ্চন” দেবী সিংহের কাছে যায় বিহিতের জন্য। কিন্তু বৃদ্ধ স্থবির দেবী সিংহ কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে অপারক হলে হতাশার ব্যর্থ আক্রোশে গুমরে ওঠে শক্তি রায়, তৈন্দুল রিয়াংরা। অভিজ্ঞ রিয়াং রামজয়, কান্তরায়, তাইন্দাদের পরামর্শমতো ওরা সকলে আশ্রয় নেয় রতনমণির কাছে। রাজনৈতিক বিদ্রোহের পথকে প্রাথমিকভাবে এড়িয়ে গেলেও ক্লান্ত, হতাশা জর্জরিত, আর্ত মানুষগুলোকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি রতনমণি; বরং ভেবেছিলেন তাদের মধ্যেকার উদ্ভুত নতুন চেতনা, শক্তিকে কল্যাণের কাজে লাগাবেন। বোঝেন এ তাঁর অন্তরের নির্দেশ। রিয়াং অঞ্চলে ঘুরে রতনমণি দেখেছেন জুম চাষে ফসল না হওয়ায় রিয়াং ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে হাহাকার। গরিব মানুষগুলো জঙ্গলে ঘুরে সন্ধান করছে কন্দমূলের। সঞ্চিত যা কিছু ধান-গম-মকাই, তা সবই নিয়ে গেছে ধনী চৌধুরীরা। ফলে, প্রথমেই তিনি ঐক্যবদ্ধ রিয়াংদের নিয়ে ধর্মগোলা স্থাপনে জোর দেন- “ধর্মগোলার কাজে জোর দাও তাইন্দা। এবারের জুম উঠলে, ধান উঠলে সকলের কাছ থেকে ধান নেবে।... আর বাড়ি বাড়ি মেয়েরা তাঁত বুনবে।”[৯০] যে সব রিয়াং যুবকরা রাজ্যরক্ষীবাহিনিতে নাম লিখিয়েছিল, তারাও ফিরে আসতে চায়। নতুন করে সেনাবাহিনিতে যোগদানেও ভাঁটা পড়ে। এরজন্য রতনমণিকে চিহ্নিত করে খগেন রায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্দেহের আওতায় নিয়ে আসে রতনমণি ও তার দলকে। এই চিহ্নিতকরণের লক্ষ্য ছিল তারা, যারা খগেন রায়ের “রায়কাঞ্চন” হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, অন্যদিকে সরকারের হিতৈষী সেজে “রায়কাঞ্চন” পদটার

অধিকার দ্রুত করায়ত্ত করাই ছিল খগেন চৌধুরীর উদ্দেশ্য। খগেন চৌধুরীর রতনমণিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাপানি আগ্রাসনের পটভূমিতে "জাপানিদের চর" বলে প্রমাণ করার চেষ্টা যে কিছুটা সফল হয়েছিল, তার প্রমাণ রতনমণি ও তার বিশ্বস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। সরকারি নির্দেশেই বড়ো দারোগা রতনমণিসহ কান্ত রায়, খুশীকৃষ্ণ ও মুকুন্দ রায়কে তওখম্ আশ্রম থেকে ধরে নিয়ে যায় আগরতলায়। যদিও ঔপন্যাসিক জানান, সেদিন রতনমণি স্বেচ্ছায় সদরে গেছিলেন। কারণ, তার মনে হয়েছিল রাজদরবার পর্যন্ত গরিব রিয়াংদের দুর্দশার কথা, তাদের ওপর চৌধুরীদের অত্যাচারের খবর পৌঁছোয় না। তিনি এই সুযোগে রিয়াংদের এই দুরবস্থার চিত্র রাজদরবারের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তৎপরতার মধ্যে, রাজ্যরক্ষীবাহিনি গঠনের প্রাক্কালে ইংরেজসরকার অনুগত ত্রিপুরার মহারাজসহ তাঁর অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্মচারীদের কাউকে ক্যাপ্টেন, কাউকে লেফটেনান্ট পদ দেয়। রতনমণি ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল রাজদ্রোহিতার। মেজর ব্রজেন্দ্র দেববর্মাকে সেই বিষয়ে রতনমণি সুস্পষ্টভাবে জানান ত্রিপুরার রাজা নয়, খগেন্দ্র রায়দের বিরুদ্ধেই তাদের প্রতিবাদ- "রিয়াং কখনও রাজার বিদ্রোহী হবে না, সে রাজার কাছে যুগ যুগান্তর থেকে শপথবদ্ধ।"[৯১] প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার রাজা ও রিয়াংদের সম্পর্ক নিয়ে কথিত আছে তুইক্লুহা, ইযুৎসিকা, পাইসিকা ও তুইব্রুহা নামক চারজন রিয়াং সর্দার ত্রিপুররাজের আশ্রয়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে কোনো একসময় বহু অনুচর নিয়ে তৎকালীন রাজধানী অমরপুরে এসে উপস্থিত হয়। তদানিন্তন ত্রিপুররাজ মহেন্দ্র মানিক্যের সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়ার বহু প্রচেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে নিতান্ত খাদ্যসংকটে পড়ে তারা ত্রিপুররাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গোমতী নদের পুজোর বাঁধ ভেঙে দেয়। এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে তারা মহারানি গুণবতীর শরণাপন্ন হয়। মহারানি সমস্ত বিষয়টা অবগত হওয়ার পর রিয়াংদের মুক্তি দেন এবং

কথিত আছে, একটা কাঁসার বাটিতে স্তনের দুধ খাইয়ে রিয়াংদের সন্তানের স্থান দেন তিনি। সেইসময় থেকেই কাঁসার বাটি রিয়াংদের কাছে অতি পবিত্র জিনিস। ফলে রিয়াংরা ত্রিপুরার রাজবংশের প্রতি অনুগত; রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তারা করবে না। অথচ রাজা বীরবিক্রম এই আবেগ বুঝতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, জানা যায়- "বীরবিক্রম যতটা আগ্রহী ছিলেন রাজধানীর সৌন্দর্য বিকাশে, ততটাই উদাসীন ছিলেন অরণ্যের কোলে বাস করা প্রজাদের অবস্থার প্রতি। এখনও অনেকে অনুযোগ করে বলেন, ঠাকুর সম্প্রদায়, ত্রিপুরী সম্প্রদায় আর বাঙালিরা ছিল বীরবিক্রমের বুকের মানুষ, আর অন্যরা ছিল পিঠের। ১৯৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহের জন্য ত্রিপুরার রাজতন্ত্র, রাজদরবার এবং স্বয়ং মহারাজ বীরবিক্রম কেউই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সমসাময়িক ইতিহাস, বিভিন্ন তথ্য মহারাজের উদাসীনতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।"[৯২] ফলে রতনমণির বন্দিত্ব ঘোচে না। রতনমণির বন্দিত্বের সুযোগে খগেন রায় ও তার অনুচররা সাধারণ রিয়াংদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। অন্যদিকে, রতনমণিকে বন্দি অবস্থায় প্রথমে রাখা হয় আগরতলার কোতোয়ালি থানায়, পরে আনা হয় রাজদরবারের বিনন্দিয়া জেলে। সেখান থেকে ভ্রমর দেববর্মা নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রাজকারাগার থেকে সুরক্ষিত পালিয়ে যাওয়াকে সাধারণ রিয়াংরা রতনমণির অলৌকিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করে। রতনমণি সম্পর্কে প্রচারিত হয় নানা অলৌকিক কাহিনি। দূর দূরান্ত থেকে আসা রিয়াং-এ ভরে ওঠে রতনমণির আশ্রম। রতনমণি বোঝেন হতাশ ও অত্যাচারে ক্লান্ত মানুষগুলো তাকে কেন্দ্র করেই বাঁচতে চাইছে। তিনি এও বোঝেন ব্রিটিশশাসক অনুগত ত্রিপুরার রাজতন্ত্র বা মহারাজ বীরবিক্রম খগেন রায়দের অত্যাচার থেকে নিরীহ রিয়াং প্রজাদের রক্ষা করতে অপারক। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় এতকালের অত্যাচারিত রিয়াংরা অত্যাচারের প্রত্যুত্তর ফিরিয়ে দিতে চায় নিজেরাই "রতনমণির মনে

হয় ধাপে ধাপে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। হাজারো মানুষের মনের মৌন মূক প্রতিবাদকে তিনি মুখর করে তুলবেন।"[৯৩] প্রায় বাইশ হাজার রিয়াং রতনমণির নেতৃত্বে গড়ে তোলে তাদের স্বাধীন রাজ্য। উদয়পুরের পার্বত্য এলাকা তুইছারবুহার অরণ্যপ্রদেশে গড়ে ওঠে তাদের ক্যাম্প। তাদের রাজ্য। রতনমণি রিয়াংদের ফিরিয়ে দিতে চান তাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে, হারানো রিয়াং রাজ্যকে। ত্রিপুরা রাজসভার আদলে গড়ে ওঠে পাঁচমন্ত্রীর মন্ত্রীসভা। তৈরি হয় সেনাবাহিনি। মন্ত্রীরা হলেন তুইহারবুহার তাইন্দা রায়, দক্ষিণ মহারানির শিলারাম রিয়াং, অমরপুরের কানাইচন্দ্র রিয়াং, নিধিরাম রিয়াং ও বিশ্বমণি রিয়াং। সেনাপতিরা হলেন শক্তিরায়, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, কান্তরায়, সর্পজয়, হান্দাই সিং। কোষাধ্যক্ষ পূর্ব বগাফার রামজয় রিয়াং, মন্ত্রীসভা ও সেনাবাহিনির গঠনের পরই অত্যাচারী চৌধুরীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় রিয়াংদের অভিযান। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় খগেন রায় ও তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা। রিয়াং চাষিদের জমি-ফসল-লুঠ করে গড়ে ওঠা চৌধুরীদের সম্পত্তি দখল করে বিদ্রোহীরা। শুধু চৌধুরী নয়; সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বর্ধিষ্ণু লোকেরাও সপরিবারে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেয় এতকালের অত্যাচারীদের ঘর-বাড়ি। অমরপুর-বিলোনিয়া দখল করে বিদ্রোহীরা। গঙ্গারাম রিয়াং-এর ওপর হামলা হয়, তার বাড়ির গরু-বাছুর-ছাগল-শুয়োর ও ধান তুলে নিয়ে যায় বিদ্রোহীরা। প্রাণনাশের হুমকি দেয়। গঙ্গারাম রিয়াং-এর অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্তের নির্দেশ আসে উদয়পুর থানার মিহিরচন্দ্র চৌধুরীর কাছে। সেই তদন্তের ভার মিহিরচন্দ্র অসুস্থতার অজুহাতে চাপিয়ে দেন উদয়পুর থানার দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত দারোগা দীনেশচন্দ্র দাশের ওপর। এই দীনেশচন্দ্র দাশের জবানি থেকেই সেইসময়ের ঘটনাপ্রবাহের কথা বিস্তারিত জানা যায়। তিনি জানান- "পরদিন সকালে আমি থানার কনস্টেবল শরৎদাস, বিধু মজুমদারসহ এই মোকাদ্দমার তদন্তে রওয়ান হই। আমার সঙ্গে বাদী গঙ্গারাম রিয়াং ও এখানকার রাজপ্রসাদ চৌধুরী ও আরো ২/১ জন আদিবাসী রওয়ানা

হয়।"[৯৪] বাদী গঙ্গারাম রিয়াং-এর বাড়ি থেকেই দারোগা দীনেশ দাশ ও তার কনস্টেবলদের তুলে নিয়ে যায় বিদ্রোহীরা তুইনানী ক্যাম্পে। দীনেশচন্দ্র এই সময়ই জেনেছিলেন রতনমণির দল তুইনানী ও তুইছারবুহায় দু'টি ক্যাম্প বানিয়েছে এবং এই দুই ক্যাম্পে প্রায় দশ-বারো হাজার লোক আছে। চৌধুরীদের কাছ থেকে লুঠ করা সব মালই মজুত হয় এই দুই ক্যাম্পে। ধানের গোলাও প্রস্তুত করেছে তারা। তুইনানী ক্যাম্পে রতনমণি না থাকায় দীনেশচন্দ্র দাশেদের সেখান থেকে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তুইছারুবুহা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ক্যাম্পের মন্ত্রীসভার ঘরের যে বর্ণনা দীনেশচন্দ্র দাশ দিয়েছেন, তা হল– "এ ঘরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। খুব বড় মাটির ঘর। মধ্যস্থলে উঁচু বেদীতে ফরাস পাতা, মন্ত্রীদের আসন দামী কাপড় দিয়ে মোড়ান ও পাঁচজনের পাঁচটি তাকিয়া, সম্মুখে পশ্চিম দিকে। ঘরে চেয়ার বা অন্যকোন আসন নেই। পূর্বদিকে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একখানা বাঁধানো ফটো বাঁশের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। মন্ত্রীদের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ও মাথায় সিল্কের পাগড়ী। কাঁধে সিল্কের আচকান। সঙ্গে তরবারি আছে। এ ঘরটির উত্তর অংশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কয়েদখানা করা হয়েছে।"[৯৫] মহারাজা বীরবিক্রমের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা না থাকলেও রিয়াংরা মহারাজের বিরুদ্ধে মূল বিদ্রোহ করেনি, চৌধুরীদের বিরুদ্ধেই ছিল তাদের প্রতিবাদ। বীরবিক্রমমাণিক্য গরিব প্রজাদের এই অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের বিচক্ষণতা দেখাতে পারেননি। খগেন রায়দের প্ররোচনামতো বিক্ষুব্ধ রিয়াং প্রজাদের ডাকাত ও জাপানি চর ভাবার ভুল করেছিলেন ও তাদের শায়েস্তা করার প্রস্তাবে সরকারি শীলমোহর দিয়েছিলেন- "মহারাজ বীরবিক্রম ওদের ফাইলে তার মত জানিয়ে দস্তখৎ করে ছাপ দেন, 'প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়।"[৯৬] বীরবিক্রমের প্রথমে নীরবতা ও রিয়াংদের প্রতি কঠোর মনোভাব যে বিদ্রোহের আঁচকে বাড়িয়ে তুলেছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত লিখছেন, জিতেন্দ্র দেববর্মা ছিলেন বীরবিক্রমের রাজসভার

খাসদরবারী ও রিয়াং বন্দি মুক্তি কমিটির সভ্য। সেই জিতেন্দ্র দেব বর্মার বয়ান থেকে তিনি জেনেছেন রতনমণির ও তার দল নানাভাবে খগেন রায় ও তার অনুগামীদের রিয়াংদের ওপর অত্যাচারের কথা, সেই সংক্রান্ত অভিযোগ নানাভাবে মহারাজের গোচরে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, "মিসিপ হরচন্দ্র ঠাকুর রাজদরবারের বিশেষ খাস দরবারী এবং খগেন রায়ের সমর্থক ছিলেন। তাহার প্রভাবের জন্য মহারাজের নিকট হতে প্রতিকার না পেয়ে রতনমণির শিষ্যগণ লুসাই চীফ রাংবুংহার নিকট অভিযোগ করে। মিঃ রাংবুং হা মহারাজের নিকট চিঠি দেন। সেই চিঠি পেয়ে মহারাজ অতি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেননি।"[৯৭] রতনমণির দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় মহারাজার দেহবাহিনির প্রধান বি. এল. দেববর্মার ওপর। বি. এল. দেববর্মার নির্দেশে ১৪/৪/১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দ বা ৩১/৭/১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্র দেববর্মা বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে তুইনানী ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই সময়কালে বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানতে পারা যায় ''ডাকাত দল'' বলে চিহ্নিত রতনমণির দলকে শায়েস্তা করার জন্য আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়ে গুলি চালাবার নির্দেশ পর্যন্ত ছিল। শুধুমাত্র অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত করা নয়, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া নির্দেশ, সংশ্লিষ্টব্যক্তিদের বাবা-মাকে ধরে রাজধানিতে আনার নির্দেশও ছিল।[৯৮] শেষোক্ত নির্দেশদ্বয় বিদ্রোহ দমনের নামে রাষ্ট্রের শোষণ ও নৃশংসতাকে স্পষ্ট করে। ১৬/৪/১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে তুইনানী ক্যাম্প দখল নেয় রাজার সৈন্যবাহিনি। এরপরে লেফ. নগেন্দ্র দেববর্মার তুইছারবুহার বড়ো ক্যাম্প দখল নেওয়ার লক্ষ্য ছিল। নগেন্দ্র দেববর্মার চিঠি থেকেই তৈন্দুলের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়া যায় শিলারামের গ্রেপ্তারের। জানা যায়, অভয়পাড়া ক্যাম্প থেকে মোট ৪৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিক্রমপুরে, এদের মধ্যে ১১০জন পুরুষ, ১২২জন মহিলা ও ২৩২ জন শিশু। তৈন্দুলের মৃত্যুর জীবন্ত নির্মাণ করলেন ঔপন্যাসিক এইভাবে- "হঠাৎ একটা গুলি এসে

বিঁধেছে তৈন্দুলের বুকে, ছিটকে পড়ে সে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নয়ন্তী। তৈন্দুলের বুক থেকে বের হচ্ছে তাজা রক্ত। মাটি ভিজে যায়।"[৯৯]

তুইনানী ক্যাম্প দখল করার পর ও অভয়পাড়া ক্যাম্পের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহে নগেন্দ্র দেববর্মার বাহিনি আছড়ে পড়ে তুইছারুবুহার ক্যাম্পে। পথে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিতে দিতে যায় বসতি, গ্রাম। এই রক্তক্ষয়, এই সংঘাত রতনমণির অভীষ্ট ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন শুধু অত্যাচারের প্রতিবাদটুকু করতে। অত্যাচারীদের স্বরূপ রাজার কাছে উন্মোচিত করতে। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতি বিশেষকিছু সমীকরণে চলে; ক্ষুদ্র লোকেদের ক্ষীণস্বর রাজার কানে পৌঁছোয় না, স্বরের তীব্রতা বাড়াতে গেলে তা রাজদ্রোহিতা হয়ে যায় রাজার কাছে, রাষ্ট্রের কাছে। ফলে, সর্বস্বান্ত সর্বহারা মানুষগুলোর বিপদ আর বাড়াতে না চেয়েই তিনি পশ্চাদোপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে গরিব রিয়াংদের রক্তপাত ভিন্ন আর কোনো ফল তখন ছিল বলে তিনি অনুভব করেননি। ফলে, তুইছারবুহার ক্যাম্প ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিদ্রোহী রিয়াংরা। ফাঁকা ক্যাম্পে সৈন্যসমেত আক্রমণ করেন নগেন্দ্র দেববর্মা। পরিত্যক্ত ঘরগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত। সৈন্যদের জয়ের উল্লাস মিলিয়ে যায়। নিষ্ফল ব্যর্থ আক্রোশে তারা জ্বালিয়ে দেয় ঘরগুলো। উদয়পুরের সরকারি গুদাম থেকে আনা টিন টিন পেট্রোলে জ্বলে যায় বিদ্রোহের গড়ে তোলা একটুকরো স্বাধীন খণ্ড। আন্দোলনের শেষচিহ্নটুকুকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাজার দমন প্রক্রিয়া শেষ হয়। যে নৃশংসতায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকল বিদ্রোহ দমিত হয়, বিশেষত রোধ করা হয় চিরঅবহেলিত দুর্বল মানুষের কণ্ঠস্বর, রিয়াং বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় না। ইতিহাস বুকের মধ্যে আগলে রাখে রাজার পক্ষপাতিত্ব, অদক্ষ রাজ্যশাসন পদ্ধতি, অবিবেচক সিদ্ধান্ত, ইংরেজ সরকারের পদলেহন ও গরিব রিয়াংদের বহুযুগবাহিত বঞ্চনা, অবহেলাকে। বিদ্রোহ সেই বহুযুগের

অবরুদ্ধ জাগরণ। যে অত্যাচারের ইতিহাস নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ছিল, তা সীমা অতিক্রম করে বহুজনের কাছে পৌঁছায়। রিয়াং বিদ্রোহ আবারও প্রমাণ করে নিষ্পেষণের ক্ষোভ একদিন বিস্ফোরিত হবেই। ইতিহাসের শুষ্ক কার্য-কারণ ও ঘটনাবলির মধ্যে চরিত্রের মনের খবর একমাত্র দেন সাহিত্যিক। শক্তিপদ রাজগুরু তৈন্দুল ও নয়ন্তীর হৃদয়ের খোঁজ দিয়েছেন পাঠককে। বিদ্রোহকে বুকে নিয়ে মারা গেছে এরা। কিন্তু যারা বেঁচে গেল? যারা নেতা নয়? যারা অতি সাধারণ গরিব রিয়াং, রতনমণিকে আশ্রয় করে মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল- তাদের খবর ইতিহাস রাখেনি। কোথায় গেল তারা? বিক্রমপুর থেকে পাওয়া একটা চিঠিতে শুধু একবার তাদের কথা বলা হয়েছিল- "উদয়পুর, অমরপুর এলাকায় দস্যুদলের আর কোন দল নাই। তাহাদের বড়ই অভাব। এমনকি লবণ ছাড়াও শুধু ভাত খাইতেছে। যেই দলটি শেষ ধরিলাম তাহারা ২/৩ দিন পর একমুঠ ভাত পায়। এও লবণ পর্যন্ত নাই; শুধু ভাত ও সিদ্ধ করুল। মেয়েদের যখন ছাড়িয়াছি তখন কাঁদিয়া বলে আমাদের ঘরবাড়ীও নাই, খাওয়ারও নাই। কোথায় যাইব, আমাদের উপায় কি?"[১০০]

রিয়াং বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাইন্দা রিয়াং, শ্রীকান্ত রিয়াং, তবিরাম, শিলারাম, হান্দাই সিং, রামজয়, বাহাদুর রায় প্রমুখ। প্রায় দুই তিন হাজার বিদ্রোহী রিয়াংদের সঙ্গে এই নেতাদের ধরে আনা হয় আগরতলায়। পুলিশের গুলিতে লড়াইয়ে মারা যায় তৈন্দুল, নয়ন্তী, দাবা রায়, চৈত্র সেন। আত্মগোপন করেন রতনমণি। মূল অভিযুক্ত রতনমণিকে ধরতে রাজা সাহায্য চান ইংরেজ সরকারের। প্রায় ছয়মাস পর ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন রতনমণি। তাকে প্রথমে রাখা হয় চট্টগ্রামের জেলখানায়। আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজ সরকার রতনমণিসহ কান্ত রায়, মুকুন্দ রিয়াং প্রমুখদের ত্রিপুরা রাজ্যরক্ষী বাহিনির হাতে তুলে দেয় বিচারের জন্য। আখাউড়া স্টেশনে এই দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্যরক্ষী বাহিনি বন্দিদের নিয়ে রওনা হয় আগরতলার উদ্দেশ্যে। রতনমণি ও তাদের

সঙ্গীদের ভিন্ন গাড়িতে তোলা হয়। রক্ষী বাহিনির বিচারের স্বরূপ প্রকাশ পায়। মুকুন্দ দেখেন- "মুকুন্দের চোখের সামনে একটা নির্মম ছবি চকিতের জন্য ভেসে ওঠে।...ও যেন দেখছিল একটা জিপের পেছনে বেঁধে কাকে ওই পথ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কারা নিয়ে চলেছে রাতের অন্ধকারে।"[১০১] মুকুন্দের মতো পাঠকও একইভাবে চমকে ওঠে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের কদর্যতায়। রতনমণির যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটে। বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করে রাষ্ট্র। বিদ্রোহকে নিশ্চিহ্ন করার এত আয়োজনের মধ্যেও বেঁচে থাকেন রতনমণি। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন রতনমণি। রিয়াং আদিবাসীদের গানে অমর হয়ে যান তাদের গুরু।

রিয়াং বিদ্রোহের সমসময়ে ভারতের অন্দরে ছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ আর বাইরে ছিল আজাদ-হিন্দ্ বাহিনির স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র তৎপরতা। রতনমণির সঙ্গে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত স্বদেশি কাজকর্মের যোগ পাওয়া না গেলেও ঔপন্যাসিক চট্টগ্রামের জেলে থাকাকালীন রতনমণিকে দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে নিজের স্বপ্নকে সফল হতে দেখান- "ওর সারা মনে জাগে একটি তৃপ্তির আশ্বাস। তিনি ব্যর্থ হন নি। এই আন্দোলন ত্রিপুরার অরণ্য গহনে একটি স্ফুলিঙ্গের মত ফুরিয়ে যাবে না। উত্তরকালে এই একটি সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মত দিক দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হবে, রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। সে দিনের আর দেরী নেই।"[১০২]

ব্রিটিশশাসিত পরাধীন ভারতের চোখে ছিল স্বাধীনতাকেন্দ্রিক এক অপূর্ব স্বপ্নের আবেশ। পরাধীন বুকে দেশের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছিল সেই প্রত্যাশার যে, এই স্বাধীনতা সাধারণের জীবন থেকে সমস্ত অন্যায়, দারিদ্র্য ও অত্যাচারকে মুছে দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল স্বাধীন ভারতে দারিদ্র্য ও

বঞ্চনা থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেলই না, উপরন্তু মাথাচাড়া দিল ব্রাহ্মণ্যবাদ আর তদ্‌জনিত ফ্যাসিবাদ। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে বিধ্বস্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রের বেড়ি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হতে পারা কৃষিনির্ভর ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকশ্রেণি জমি হারিয়ে খেতমজুর ও আধিয়ার বা ভাগচাষিতে পরিণত হয় এবং নব্য জমিদারশ্রেণির হাতে চলে যায় জমির মালিকানা। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও জোতদার শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে সংগঠিত করতে ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে ''সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি''। ব্রিটিশ ভারতের বাংলাপ্রদেশে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়, তাদের দ্বারা ১৯৩৮ সালে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে জমিদারিপ্রথা বাতিলের সুপারিশ ছিল, যার প্রয়োগ হয় স্বাধীন ভারতে। সঙ্গে ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা চাষিকে দেওয়ার প্রস্তাব হয়। এই দুইভাগের দাবিতেই ১৯৪৬ সালে বর্গাদাররা তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশ্য এর পূর্বেই কৃষকসভার নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকেই জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির কৃষকরা জোতদারদের নানারকম বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই আধিয়ার আন্দোলনে কৃষকেরা জোতদারদের খামারের পরিবর্তে ফসল তুলত নিজেদের গোলায়। কারণ, জোতদারদের খামারে ফসল তুললে সেই ফসলের অর্ধাংশও কৃষকেরা পেত না। এই সংগ্রামের ফলে ঠাকুরগাঁও-তে ঠিক হয় জোতদারের বাড়ির ''দশের খোলান'' বা মধ্যস্থ স্থানে ধান তোলা হবে। ১৯৪৬ সালে খুলনা জেলার মৌভাগে জেলার কৃষক সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রায় ১৯টি জেলার কৃষকেরা এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে অংশ নেয়। সংগ্রামের প্রধান অঞ্চল ছিল মূলত উত্তরবঙ্গ- দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ

অঞ্চল। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ, জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষির খামারে ফসল তুলতে দিতে হবে, ভাগচাষির জমির ওপর স্বত্ব স্বীকার করে নিতে হবে, অন্য নানারকম আদায় বন্ধ করতে হবে। এই আন্দোলনে আদিবাসীরাও যোগদান করেছিল। ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ির সর্বেশ্বর ডালু জোতদারদের গুন্ডাদের হাতে নিহত হন। এই হত্যার প্রতিবাদে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সুপ্রকাশ রায় জানাচ্ছেন– "৮ই ডিসেম্বর সুসংয়ে তেভাগার সমর্থনে ও টংক প্রথার উচ্ছেদের দাবিতে পাঁচ হাজারেরও বেশি আদিবাসী কৃষক ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক বিরাট সভা করে।"[১০৩] টংক প্রথায় ফসল উৎপন্ন না হলেও জোতদারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল চাষিকে দিতে হত। দিনাজপুর জেলার রাজবংশি ও সাঁওতাল কৃষকরা এই আন্দোলনে যোগদান করে। ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৭, দিনাজপুর শহরের নিকটবর্তী চিরির এলাকার পুলিশের গুলিতে নিহত হন শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। এনারাই ছিলেন তেভাগার প্রথম শহিদ। শিবরাম ছিলেন সাঁওতাল আধিয়ার আর সমিরুদ্দিন ছিলেন খেতমজুর- "বাংলাদেশময় সেই তেভাগার সংগ্রামের প্রথম সারিতে স্থান নিয়েছিল ময়মনসিংহের হাজং চাষী, উত্তর বাংলার মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর, রংপুর-জলপাইগুড়ি জেলা, আর দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙড়ের লক্ষ লক্ষ বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুর। একটানা পাঁচ বৎসর (১৯৪৬-১৯৫০) কাল চলেছিল এই রক্তঝরা সংগ্রাম।"[১০৪] আধিয়ার বা বর্গাদাররা জোতদারের জমি চাষ করে ফসলের অর্ধেক অংশ পেত। ফসলের উৎপাদন খরচ যেমন, বীজ, সার, হাল, বলদ এইসব সমেতই ফসলের অর্ধেক পেত। উপরন্তু থাকত নানান পাওনা। ফলে, আধিয়ারের হাতে শেষপর্যন্ত কিছুই থাকত না। পুলিশি নৃশংস দমননীতি সত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রণীত হল বর্গাদারি আইন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ বিল পাশ হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়

ওই বছরের নভেম্বর মাসে। ১৯৫৫ সালে ভূমিরাজস্ব আইন আনা হলেও বেনামি জমি বা গোপন জমিস্বত্বের পরিমাণ বেড়ে গেল। চাষিদের অবস্থার পরিবর্তন হল না। ইতিমধ্যে নিজাম-শাসিত তেলেঙ্গানায় কৃষকেরা নিজাম, জায়গীরদার, জমিদার, দেশমুখ দলের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অন্ধ্র মহাসভা কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেয়। ১৯৪৪ সালে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, ১৯৪৮ সালে বিদ্রোহীরা অত্যাচারী জমিদার, দেশমুখ, জোতদারদের হাত থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জমি উদ্ধার করে স্বাধীন মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলে। তেলেঙ্গানার কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল হায়দ্রাবাদের শ্রমিক ও ছাত্রসম্প্রদায়। এইসমস্ত আন্দোলন ও কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়াই নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিল। মনে করা হয়, নকশালবাড়ি আন্দোলন তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিপ্লবী উত্তরসূরি। উভয়ক্ষেত্রেই কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটা নিবিড় যোগ ছিল, যদিও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে রাজ্যে রাজ্যে চালু হওয়া ভূমিসংস্কার কৃষকদের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারেনি। জমিদারশ্রেণির বিলোপ ঘটলেও বেনামে জমির ওপর অধিকার কায়েম রাখল জমিদার থেকে জোতদারে পরিণত হওয়া মানুষেরা। জমি থেকে উৎখাত হয়ে খেতমজুর বা বর্গাদারের সংখ্যা বাড়ল। বলা যায়, উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন তেমন ঘটল না। "অন্যভাবে ১৯৫১ সালে মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যার মাত্র ২৯% শতাংশের হাতে জমি ছিল মোট জমির মাত্র ৪০%। এরা যেহেতু প্রকৃত অর্থে কৃষিজীবী তাই এদের মধ্যে ধনী ও মাঝারী কৃষকদেরও ধরা হয়েছে। অপরদিকে ৬০% জমি ছিল কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে না এরকম সামন্ত জমিদারদের হাতে যারা গ্রামীণ জনগণের মাত্র ২%।...মোট কৃষি জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ মানুষ ছিল প্রজা কৃষক। এদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক কৃষকেরই প্রজাস্বত্বের অধিকার ছিল।...কিন্তু যাদের

প্রজাস্বত্বের অধিকার ছিল না তাদের খাজনার হারও নির্দিষ্ট ছিল না, কোথাও কোথাও এদের ফসলের ৩/৪ ভাগও মালিককে দিতে হত এবং যে কোনো সময় উচ্ছেদ করা যেত।"[১০৫] পরবর্তী দশ বছরে ভূমিসংস্কারের ফলেও উৎপাদন সম্পর্ক ও কৃষকের অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি- "১৯৬০-৬১ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশের মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের হাতে ছিল মোট কৃষিজমির মাত্র ২৫.৪ শতাংশ, ঠিক তার ওপরের ১০ শতাংশের হাতে ১৯ শতাংশ এবং একেবারে ওপরের ১০ শতাংশ জনসংখ্যার হাতে কেন্দ্রীভূত কৃষিজমির পরিমাণ মোট কৃষিজমির ৫৬.২ শতাংশ।"[১০৬]

তেভাগা আন্দোলনের সময়কালেই ১৯৪৬ সালে দার্জিলিং-এ গড়ে ওঠে "চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন"। ওই বছরের ১৮ই জুন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৭ দফা দাবি জানিয়ে সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিক উচ্ছেদ ও লক আউটের প্রতিবাদে লড়াইতে শ্রমিকরা জয়লাভ করলে ১৯৫৪ সাল থেকে তরাই অঞ্চলের বিভিন্ন চা-বাগানে ইউনিয়ন করে তোলার কাজ শুরু করেন চারু মজুমদারেরা। ১৯৫৫-৫৬ সালে তরাই অঞ্চলে চা-শ্রমিকদের বোনাসের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল হাজার হাজার চা-শ্রমিক। শ্রমিক-কৃষকদের অধিকারের লড়াইতে সামিল হয়েছিল দেশের ছাত্ররা। ১৯৩৬ সালে জন্ম নেয় "অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন"। এই ছাত্র ফেডারেশন তৈরির কয়েকমাস পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে নৌ-বিদ্রোহ, আগস্ট আন্দোলন সহ একাধিক আন্দোলনে ছাত্র-যুবরা সামিল হয়েছিল। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সেনানিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫ সালে তারা ধর্মঘট পালন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও ছাত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়নি; বরং আরও পরিপুষ্টতা পেয়েছিল। কারণ, তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসেনি। শৈবাল মিত্র লিখছেন- "উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দু'চার বছর আগে-পরে যাদের জন্ম,

ষাটের দশকে তারা ছাত্র ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রজন্ম দেখল, তাদের দেশ, সমাজ, দীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত। দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ ছালচামড়া উঠে গিয়ে এক পচাগলা শবদেহ এই ত্রিকোণ মানচিত্রের মহাশ্মশানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।"[১০৭] পঞ্চাশের দশকে স্বাধীনতাজনিত আবেশ কিছুমাত্র থাকলেও সরকারি যোজনার ব্যর্থতা, তীব্র খাদ্যসংকট, আর্থিক মন্দা প্রভৃতি শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ছাত্রমানসে ক্ষোভের জন্ম দেয়। এই দশকে ছাত্ররা ট্রামভাড়াবিরোধী আন্দোলন, '৫৯-এর খাদ্যআন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তেভাগা, তেলেঙ্গানা ও '৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের পর ষাটের দশক ছিল ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে ঘটনাবহুল দশক। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ ও ছাত্র ফেডারেশন শাসকদলের কৃষক-শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরোধিতা শুরু করে। অসীম চট্টোপাধ্যায় ছাত্র মানস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখছেন- "যুব চেতনার এক লাফে চরম উদ্দেশ্য সাধনের নৈতিকতায় সংসদীয় রাজনীতির 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' দড়ির খেলা, আংশিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের নমনীয়তা তৈলাক্ত বাঁশে আরোহণের বাঁদুরে প্রয়াস বলে মনে হয়। ষাট দশকের যুব চেতনায় এই প্রবণতা নিহিত ছিল। উপরন্তু ঐতিহাসিক প্রতিটি সন্ধিক্ষণে সদা-অপ্রস্তুত ভারতের বামমার্গী আন্দোলন এই পর্যায়েও ছিল নানা দুর্বলতায়, দ্বিধায় সুবিধাবাদে আকীর্ণ। '৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের হঠাৎ সমাপ্তি যুবমনে সংশয় আনে, '৬৭ সালের নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশমান ট্রাম-বাস ও প্রেসিডেন্সিকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারের ফরমান এই সংশয়কে সন্দেহে পরিণত করে এবং পরিশেষে সংসদীয় সরকার রক্ষার প্রয়োজনে নকশালবাড়িতে আপন দলীয় কর্মীদের হত্যা করে নিজেদের গড়া কৃষক আন্দোলনের রক্তাক্ত অবদমন ব্যাপক ছাত্র যুবকদের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধকে আহত করে যুক্তফ্রন্টীয় বামদলগুলির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়।"[১০৮] ১৯৬৬ সালের খাদ্যআন্দোলনের সময় থেকে কৃষক ও শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি আন্দোলনের লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে

থাকে। ওই বছর ২২শে আগস্ট বীরে প্রধান নামে এক চা-শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৬৭ সালের ১৮ই মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সম্মেলনে গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান করা হয় এবং জোতদার ও বিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলা হয়। এই কৃষক বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক যে ১০টি বিপ্লবাত্মক কাজে সচেষ্ট হয়েছিল, যথা জমির পরচা নয়, কৃষক কমিটির হুকুম, জমির আইনি কাগজ পুড়িয়ে ফেলা, মহাজন ও জোতদারদের দাবির সমস্ত ঋণ বাতিল প্রভৃতির উল্লেখ কানু সান্যালের ''তরাইয়ের রিপোর্ট''-এ পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালে ৯ই মে তরাইয়ের সন্ন্যাসিস্থান চা-বাগানের কৃষকেরা জোর করে মালিকদের জমি দখল করে। অন্যান্য চা-বাগানেও চা-শ্রমিকরা জমি দখল করতে শুরু করে। এইসময় নকশালবাড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ফসল ও বেনামি জমি দখলকে কেন্দ্র করে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৭ সালের ২৪ শে মে (মতান্তরে ২৫শে মে) শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি ব্লকে হাতিঘিসার কাছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনি জোতদারের সমর্থনে গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বাঁধে এবং সোনাম ওয়াংদি নামের এক পুলিশ অফিসার নিহত হন। পরেরদিন সরকারি সশস্ত্র বাহিনির হাতে ১১জন মারা যায়, যার মধ্যে মহিলা ও শিশুও ছিল। এরপরে ব্যাপক পুলিশি অভিযান শুরু হয়। সংগ্রামের বার্তা তরাই অঞ্চল ছাড়িয়ে সারা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্টদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালের ১৪ই জুন নকশালবাড়ির সমর্থনে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে গণকনভেনশনের আয়োজন হয়। ছাত্ররাই এই কনভেনশনের মূল দায়িত্বে ছিল। এখানে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৯ সালে ২২শে এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গড়ে ওঠে এবং এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন চারু মজুমদার। ১লা মে এই পার্টির ঘোষণা হয় সর্বসমক্ষে এবং

তারপর থেকেই চারু মজুমদারসহ আরও কিছু নেতা আত্মগোপন করেন। এই পার্টির নেতৃত্বেই নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন বাংলা ও ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

চারু মজুমদার চেয়েছিলেন সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা ছাত্রেরা গ্রামে গিয়ে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারার মূলবার্তাগুলো পৌঁছে দেবে সেই সব জনমানসে। ডাক দেওয়া হয় ''গ্রামে চলো''র। সেইসময়ের কলকাতা, মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া, চব্বিশ পরগণাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র-যুবরা এই ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগদান করে এবং শহর ছেড়ে গ্রামে কৃষকদের প্রয়োজনে ও জোতদারদের থেকে ক্ষমতা দখলের জন্য গ্রামে চলে যায়। স্বর্ণ মিত্রের *গ্রামে চলো* (১৯৭২)এই ডাকের পটভূমিতেই লেখা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র অনিরুদ্ধ বাগচি ওরফে রঘুর শহুরে জীবনকে পেছনে ফেলে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রাতেই উপন্যাসের শুরু। শহরের জীবনকে একেবারের জন্য ছেড়ে আসা যে সংশয়াদীর্ণ ছিল না, এমন নয়। রঘু ভেবেছে- ''এমন জমাট স্তব্ধতায় রঘুর মধ্যবিত্ত মনটা আবার ভারী হয়ে উঠতে থাকে। হঠাৎ যেন এলোমেলো ভাবে কোলকাতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে- মা'র শেষবারের চাউনি; শহরের জনস্রোত; কমরেডদের নানা রসিকতা; প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠ! চলার গতিকে যেন বারবার টেনে ধরে- কোলকাতার পিছু-টান। আর তখনই বাংলা-বিহারের এই সটান্ শুয়ে থাকা নির্জন পাকা রাস্তার ওপর রঘুর নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ ঠেকে।''[১০৯] প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর স্বীকারোক্তি- ''শহরের ছেলেরা ও দু'একজন মেয়েও গাঁয়ের থাকাখাওয়ার কঠিন অসুবিধার সঙ্গে পটুত্বের সঙ্গেই মানিয়ে নিত। সমস্যা হত একাকিত্ব- নেই কফি হাউস, বন্ধুদের আড্ডা, প্রেমের মানুষের দেখা, মায়ের স্নেহ। গ্রামের ঢিমে-তালের জীবন, কৃষকের মিতবাক প্রকাশভঙ্গি এত আলাদা ঠেকত যে, মনে হত বিদেশে নির্বাসন

ঘটেছে।”[১১০] উপন্যাসে সীমান্ত বাংলার রুক্ষ পটভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, মহাজনি শোষণ, আদিবাসী মানুষগুলোর নিত্য লড়াইয়ের কথা আছে, যে লড়াই স্বাধীনতা উত্তরকালেও শেষ হয়নি। ঝরিয়ার সাঁওতালপল্লির দারিদ্র্য দুর্দশালাঞ্ছিত জীবনকে প্রত্যক্ষ করে রঘু। তারা কেঁদু ফল খেয়ে খিদে মেটায়। তাদের দুধের শিশুরা বন্ধ ঝাঁপের মধ্যে নেতিয়ে থাকে। দুধের বদলে তাদের মুখেও ওঠে হাঁড়িয়ার ফোঁটা, তীব্র প্রতিবাদের চিৎকারে নীল হয়ে আসা শিশু আবার নেতিয়ে পড়ে। এভাবে দিন যায়। কালীপদ হাঁসদা শোনায় ভূমি অকর্ষিত, বন্ধ্যা রাখার কারণ। যুগ যুগ ধরে জঙ্গল পরিষ্কার করা জমিতে বা অনুর্বর জমিতে সাঁওতালদের পরিশ্রমে সোনার ফসল ফললে, সেই জমিতে লোভী জমির কারবারিদের কুনজর পড়ত এবং নানা ছলে সেই জমি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করা হত। শোষণের সেই ধারা উত্তর-স্বাধীনতা সময়েও সমানে চলেছে- “আজও সেই পুরোনো দিনের মতো রক্ত শোষণ চলতিছে। বরং দিন দিন আরো বাড়তিছে। অথচ মোরা সকলেই দিনমান পরিশ্রম করি।’একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসে কালীপদ। অদম্য শ্রেণী ঘৃণা আর ধৈর্যের ছাপ আর মুখটাকে কেমন যেন থম্‌থমে করে তুলেছে!”[১১১] স্বাধীন ভারতের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাও যে কৃষকস্বার্থে কাজে লাগেনি, তারও প্রমাণ মেলে এই উপন্যাসে যেখানে শালবনীর শেষ সীমানায় মহাজন সীতানাথের প্রাসাদের মতো বাড়ির উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক লিখেছেন- “পশ্চিমদিকে প্রায় দেড়তলা সমান উঁচু ধানের গোলা। গোলায় সারা বছরের মজুত ধান। এছাড়া বাড়ির প্রায় একতলা নীচে সিমেন্টের বাঁধানো ঘর। সেখানেও থাকে মজুত ধান। বাড়ির পেছনে লম্বা টালির ছাউনি দেওয়া গোয়ালঘর। সেখানে দশটি গরু এবং ষোলটি বলদ। এদের প্রত্যেকের নামই মানুষের মতো। কারণ এদের প্রত্যেকের নামেই দশ বিঘে করে জমি আছে।”[১১২] ঝরিয়ার সাঁওতালপল্লি পেরিয়ে রঘু সত্যবানের সঙ্গে পৌঁছে যায় আরও গভীরে। জঙ্গলের গভীরে। উপলব্ধির গভীরে। কলকাতায় বড়ো হয়ে ওঠা ইতিহাসের মেধাবি

ছাত্র রঘু এখানে না এলে জানতেই পারত না ইতিহাসের বইতে যে ভারতের কথা লেখা থাকে তার থেকে সত্যিকারের ভারত পৃথক। রাজা-রাজড়াদের কথা, তাদের যুদ্ধের কথা বলা ইতিহাসের বই এই মানুষগুলোর লড়াইয়ের কথা লেখে না। শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিসংগ্রামের কথা লেখে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা হয় না। জামুয়ার গভীর জঙ্গলে শবরদের অরণ্য ঢাকা নড়বড়ে নিচু চালাগুলোকে দেখে সংশয় জাগে রঘুর- "এতো বড় বড় মানুষ এর ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে কি করে? ঝড়-বৃষ্টি তো দূরের কথা, সামান্য ফুঁ-তেই হোগলার ছাউনিগুলো উড়ে যাবে।"[১১৩] পোকামাকড় ও লতাপাতা খেয়ে দিনগুজরান করা এদের কাছে ভাতের গন্ধ আজও দুঃসাহসিক স্বপ্নমাত্র। তবু এইসব বুকেই লাল টুকটুকে ভোরের স্বপ্নে বিপ্লবকে স্পন্দিত করে তুলতে চায় রঘুরা। ভোলা শবর তার মৃত স্ত্রীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে চায়। "মনে মনে গর্জে ওঠে : "ভুলবোনা মোদের অপমান। শেষ রক্তটুক্ পর্যন্ত দিয়ি নিব প্রতিশোধ। কাঁরের মুখ অনেক আগিই শান্ দিয়ি রাখিছি।"[১১৪] আকালের ভাদ্রে কালীপদ হাঁসদারা সত্যবানের নেতৃত্বে সীতানাথের বাড়ি হামলা চালায়। মহাজনের ঋণের ফাঁদে থাকা পুরনো নামি-বেনামি দলিল পুড়িয়ে দেয়, ধানের গোলার মুখ দেয় ভেঙে। গরিব, ভূমিহীন অভুক্ত মানুষরা দেখে ধানের বন্যা, আনন্দের অশ্রুতে চোখ যায় ভিজে। আনন্দে বিস্ময়ে ধানের স্রোতের মধ্যে হাতের কবজি পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকে কেউ, কেউ চিবিয়ে নেয় একমুঠো ধান। টাঙ্গির কোপে মারা পড়ে সীতানাথ, বনবিহারীকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের পথে, সামন্ততন্ত্রের ওপর আঘাতকে ঔপন্যাসিক লিখলেন এভাবে- "শরতের প্রসন্ন আকাশের তলায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল জমিদার বাড়ির জনশূন্য উঠোন। তার বুকে বহু বছরের সামন্ততান্ত্রিক দলিলপত্র দাউ দাউ করে পুড়তে থাকল।"[১১৫] বৃদ্ধ খুড়োর সংগ্রাম, মৃত্যু ও মানুষের উত্থানের সূচনাতেই শেষ হয় উপন্যাস।

জয়ন্ত জোয়ারদারের *এভাবেই এগোয়* (১৯৭৮) উপন্যাস নকশালবাড়ি আন্দোলনের কর্মসূচির বিস্তারিত ও সাহিত্যিক প্রকাশ। সিপিআই(এম এল) পার্টির গঠন থেকে বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি, কর্মী তৈরির প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসে। চারু মজুমদারের ১লা মে পার্টির ঘোষণা এখানে রূপায়িত এভাবে- "তরাইয়ের কৃষকের নেতা, নকশাল বাড়ির নেতা রেডবুক হাতে উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চে। অগণিত মানুষের বাঁধভাঙ্গা প্রাণোচ্ছ্বাস।"[১১৬] মালদা জেলার উত্তরপূর্বে সাঁওতাল অধ্যুষিত গাজল, হরিপুর আর বামনগোলায় জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের একটা গর্বের অতীত ছিল, সেই পটভূমিতেই আরও লক্ষ জিতু সাঁওতাল তৈরির উদ্দেশ্যকে বুকে নিয়ে গৌতমরা রওনা হয়েছিল কলকাতা থেকে মালদায়। ভারতজুড়ে গড়ে ওঠা লড়াই ও অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের সাফল্যের কথা বারবার এসেছে উপন্যাসে। সাঁওতালদের মধ্যে আন্দোলনের জন্য স্কোয়াড গড়ে তোলার কথা, অত্যাচারী অনাদি রায়ের ওর বাড়ির সাঁওতাল চাকর সুক্কাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার কথা, টুডুর নেতৃত্বে সেই অনাদির ওপর খতম অভিযানের চেষ্টা ও না পারার কাহিনি শোনান ঔপন্যাসিক। পার্টির "খতম অভিযানে"র সঙ্গে একাত্ম হতে অসুবিধা হয়েছিল অনেক কর্মীরই। জানা যায়, পার্টির এই লাইনের সঙ্গে সহমত ছিলেন না জঙ্গল সাঁওতাল। নকশাল আন্দোলনে সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল। সৌরেন বসু, কানু সান্যালদের বক্তব্য থেকে জঙ্গল সাঁওতালের এই খতম লাইনের বিরুদ্ধ মত সম্পর্কে জানা যায়। সৌরেন বসু বলছেন, "পার্টির 'খতম' লাইন যে তিনি মানতেন না তার প্রকাশ্য বিরোধীতা করে বা -"মানি না তাই পার্টিতে থাকবো না"– তিনি কোনদিন করেননি। খতম পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর মত প্রকাশ করে বলেছেন- "এই পদ্ধতিতে গণআন্দোলনের বিকাশ হয় তা আমি বিশ্বাস করি না।"[১১৭] কানু সান্যাল বলছেন- "...পার্টির গৃহীত লাইন নিয়ে মতভেদ

ছিল। আমি কোনদিনই খতম-এর রাজনীতির সঙ্গে একমত ছিলাম না – জঙ্গলও এ রাজনীতিকে নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারেনি। তবে পার্টির প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে সে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত কঠোর ছিল।"[১১৮] নকশাল আন্দোলনের আগে থেকেই কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত জঙ্গল সাঁওতাল জমির অধিকার দখলের লড়াই প্রকাশ্য গণআন্দোলনের পথে আসবে বলেই বিশ্বাস করতেন, গোপন ষড়যন্ত্রভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক ক্ষমতা দখলকে মেনে নিতে পারেননি। গুণময় মান্নার *শালবনি* (১৯৭৮) উপন্যাসের মূল পটভূমি *গ্রামে চলো*র অনুরূপ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্সের মেধাবি ছাত্র অনিমেশ চ্যাটার্জি ওরফে মোহন চারু মজুমদারের "গ্রামে চলো" আহ্বানে সাড়া দিয়ে চাঁদসোল গ্রামে পৌঁছায়। সেখানে আন্দোলন সংগঠনের কাজ করে। গ্রামের সঙ্গে একাত্মতায় মাহাতো মেয়ে শাম্‌লীকে বিয়ে করে। পুলিশি নকশাল দমন অপারেশনে মারা যায় মোহন। আর সেই জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে চলে বনা টুডু, পচাইরা। সংগ্রামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বনা মা লুস্‌কিকে বলে ওঠে- "ই মাটিএ খুন পড়িছে, মহনের খুন, মহনকে এই বনা টুডু তীরকাঁড়ের তালিম দিছে, মহনের খুন আছে মাটিএ, বনার খুন আছে মাটিএ...।"[১১৯]

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৭) উপন্যাসে কুরমি বাবা পশুপতি সাঁওতাল মায়ের সন্তান রুহিতন মুখ্য চরিত্র। জমির আকাঙ্ক্ষায় রুহিতনের বাবা নকশালবাড়ি পূর্বাঞ্চল চা-বাগানে মজুরের কাজ ছেড়ে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে চলে এসেছিল পাঁচ মাইল দক্ষিণে টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলের দক্ষিণে রেললাইনের পূর্ব পারে- "জমি জিরেত চাষবাসের দিকে তার মন টেনেছিল। এটা একজন কুরমির আদিম পিপাসা। নিজের একটা ঘর, এক জোড়া বলদ লাঙ্গল, আর কিছু চাষের জমি।"[১২০] কিন্তু জমির অধিকার গরিবের স্বপ্ন হতে পারে, বাস্তব নয়। পশুপতি জোতদার মোহন ছেত্রীর উঠবন্দি প্রজা, ভূমিহীন আধিয়ার- যাকে যে কোনো সময়ে জমি থেকে

উৎখাত করা যায়। কোনো একদিন রায়তের স্বত্ব পাবে এমন স্বপ্ন পশুপতির বাস্তব হয়নি। মণ মণ পলি নিয়ে এসে একখণ্ড শুষ্ক জমিতে ফসল ফলাতে ঘাম-রক্ত ঝরাতে হত তাদের। মোহন ছেত্রীর বড়ো ছেলের সঙ্গে যৌবনের প্রথমকালে রুহিতনের বন্ধুত্ব হলেও পরবর্তীকালে শ্রেণিসচেতনতা সেই বন্ধুত্বকে অস্বীকার করেছে। উপন্যাস রুহিতনের নকশাল পরিচয় দিয়েছে, তার জেলবাস, পুলিশি নির্যাতনের কথা তুলে ধরলেও আন্দোলনের কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় উঠে আসেনি। বরং, পার্টির মধ্যেকার অন্তদ্বন্দ্ব, ঘৃণা ও একনিষ্ঠ কর্মীর ভঙ্গস্বপ্নের কথাই তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। রুহিতন ফিরে এসেছে তার গ্রামে। ফিরে এসে দেখেছে লড়াইয়ের রেশমাত্র নেই, মুক্তাঞ্চল নেই। নেতা দিবা বাগচিও মারা গেছে। আন্দোলনের সময়কার শ্রেণিশত্রু চৌধুরী, জোতদারদের আত্মীয়রা তার আশেপাশে। সহযোদ্ধারা কেউ নেই। খেলু চৌধুরীর মতো কুষ্ঠ রোগের ঘৃণায় তার স্ত্রী-পুত্রেরাও তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সে ফিরে গেছে পুরনো সঙ্গী লুকানো বন্দুকের কাছে- "সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো। বন্দুকটা রইলো তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখলো জোড়া ব্যারেলের ওপর। পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এলো। তার মনে এখন একটি মাত্র সান্ত্বনা, সে অপমান ও অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে, গভীর ঘুম আসছে তার।"[১২১]

শুধুমাত্র জমির স্বপ্ন নয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে জমিকেন্দ্রিক শোষণ ছাড়াও আরও নানাবিধ শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। মহাশ্বেতা দেবীর *মাস্টার সাব* (১৯৭৯) উপন্যাসে বিহারের ভাগলপুরে নকশাল আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন জগদীশ মাহাত ওরফে মাস্টার সাব। স্বাধীন ভারতেও সমাজের মধ্যে বয়ে চলা অস্পৃশ্যতা ও হরিজন নিগ্রহের পরিবেশে জগদীশের স্কুলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার বাবা মা, প্রতিবেশিরা জানত না ভারতে সব মানুষ সমান। বাল্য বয়স

থেকে দেখে আসা হরিজন নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে মাস্টার সাব প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষে বিহারের নকশাল আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পথকে গ্রহণ করে মেয়েদের ওপর অত্যাচারকে তখন অনেকটাই কমিয়ে আনা গেছিল। *অগ্নিগর্ভ*-এর (১৯৭৮) *অপারেশন? বসাই টুডু*-তে কালী সাঁতরার সঙ্গে বসাই টুডুর আলোচনাই আখ্যানের মূল বিষয়বস্তু এবং সিংহভাগ জুড়ে। এই আলোচনাসূত্রেই খেতমজুরদের প্রতি বঞ্চনা, কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বসাইয়ের জমে ওঠা ক্ষোভ, সাঁওতাল বা নিম্নজাতির প্রতি নেতৃত্বের ঘৃণার ভাব উঠে আসে। নকশাল কর্মপদ্ধতি বা আন্দোলনের চিত্র এই আখ্যানে ধরা হয়নি। কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের আশ্রয়ে নয়, বসাই খেতমজুরের অধিকার পেতে নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছে বলে দাবি করেছে। সাঁওতাল বা আদিবাসী মানুষদের নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণের পটভূমির বিস্তৃত পরিচয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন শৈবাল মিত্র তাঁর *অগ্রবাহিনী* (১৯৯০) উপন্যাসে। উপন্যাসের পটভূমি সত্তর দশকের বীরভূম। সাঁওতাল অধ্যুষিত এই অঞ্চলে যারা ভূমিহীন, বছরে দুই-তিন মাসের বেশি জমি-জমায় কাজ পায় না। তাই পোষা ভালুক নানকুকে নিয়ে মেলায়, বাজারে খেলা দেখিয়ে রোজগার করে কানুপা। বাংলা-বিহার সীমান্তের এইসব এলাকায় ভয়ংকর জাতপাতের শোষণ। আর্থিক শোষণের ভিতও তাই। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করে এখানে গরিব কৃষককে বেগার খাটায় জোতদার। পুলিশের সাহায্যে জেল ও জরিমানা করায়। সঙ্গে আছে মহাজনি শোষণও। এই শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে চায় ব্রজদা, কিশোররা। আদিবাসীরা রবি হাঁসদার নেতৃত্বে আগে থেকেই আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের লড়াইয়ে প্রস্তুত ছিল। রবি হাঁসদা এই শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে শুধু যুক্ত হন নি, এই আন্দোলনকে সাঁওতাল আন্দোলনের সমান মর্যাদায় গ্রহণও করেন, গান বাঁধেন। সে গানের অর্থ দাঁড়ায়, যে বিপ্লবের সূচনা সিদু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের নেতৃত্বে, তার পরিসমাপ্তি হবে চারু মজুমদারের

নেতৃত্বে। কিশোর পার্টির কাজ করতে এসে দেখেছে তিনদিকে পাহাড় ও একদিকে ম্যাসাঞ্জোর ড্যামের মাঝে শাল-মহুয়ার জঙ্গল ও কেন্দু-কুঙ্গার ঝোপ। রাজনগর, রানিশ্বরের এই বিস্তৃত অংশে আদিবাসী জনপদ, যার বেশিরভাগই সাঁওতাল, তাছাড়া আছে পাহাড়িয়া, মুহুলি ও ঘাটোয়াল সম্প্রদায়। ঘাটোয়ালরা সবচেয়ে গরীব ও ভূমিহীন। এদের পেশা শিকার। সাঁওতালদের কারও কারও নিজের জমি থাকলেও বেচার অধিকার নেই। কিন্তু মহাজনের কাছে চাষের জমি বন্ধক রাখতে পারে তারা। এই বন্ধক বা ভন্নার অর্থই সাঁওতালদের কাছে জমি হাতছাড়াই অনুরূপ। ভন্নাবাবদ নেওয়া টাকার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ তারা দিতে অপারক থাকত, ফলে ভন্না জমি গ্রাস করে নিত মহাজন। বুধনের ঠাকুরদার দশ টাকা দেনা সাত বছরে হয় তেষট্টি টাকা, সেই টাকা শোধ করতে না পারায় ঘরের চৌকাঠ খুলে নিয়ে গেছে ধনী জোতদার সদাশয় সাহা। বুধনের বাবাকে বুধনের সামনেই তেঁতুলগাছে বেঁধে চাবুক মেরেছিল সদাশয় সাহা। জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এই মানুষগুলো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। পার্টির লাইন মেনে খতম অভিযান চালায়। গণআন্দোলনের পথ বাতিল করে শুধুমাত্র গেরিলা স্কোয়াড করে খতম অভিযানের পথ নিয়ে তৈরি হওয়া পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপন্যাসেও তুলে আনা হয়েছে। খতম অভিযানের প্রাথমিক আকস্মিকতা ও নৃশংসতায় দুর্বল হয়েছে বুধনের মতো কর্মীরা। গণফৌজ গঠন নিয়ে পার্টির মধ্যেকার মতভেদকেও ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। স্বাধীন মুক্তাঞ্চলকে টিকিয়ে রাখতে, আন্দোলনকে জিইয়ে রাখতে, কৃষকদের আস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে যে গণফৌজ গঠন জরুরি, গ্রামে আন্দোলনকে সংগঠিত করতে বুঝেছে কিশোর, অজিতেরা। এই উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন দিককে উন্মোচিত করেছেন লেখক ও আদিবাসী রীতিনীতি, বিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের অংশগ্রহণকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

জমি ও জঙ্গলের অধিকার রক্ষাই মূলত ভারতের প্রায় সব আদিবাসী আন্দোলনের মূল কারণ। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বিভিন্ন সময়ে নিজ অধিকারের দাবিতে আদিবাসী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। জঙ্গল নির্ভর আদিবাসীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে জঙ্গলের অধিকার, লুঠ করা হয়েছে জমি। কখনও খনি আবিষ্কার, কখনও বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সরকারও উদ্বাস্তু করেছে আদিবাসীদের, অধিগ্রহণ করেছে জমি। সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের অঙ্গ খড়কাই নদী বাঁধ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে, আদিবাসীদের পক্ষে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে এই সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিল ইলিয়াগড়ের গঙ্গারাম কালুন্ডিয়া। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা *সুরজ গাগরাই* (১৯৮৩) উপন্যাসের এই সুরজ গাগরাই আসলে গঙ্গারাম। ঔপন্যাসিক বলছেন- "সুরজ গাগরাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।"[১২২] ১৯৮২-৮৩ সালের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নিয়ে এসেছেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া কোল বিদ্রোহের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ। এই বিদ্রোহের উল্লেখ স্পষ্ট করে আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনা ও শোষণের পরিবর্তন ব্রিটিশ সরকারের থেকে পাওয়া স্বাধীনতা আনতে পারেনি। এর কারণ খুঁজলে বোঝা যাবে, স্বাধীনতা অনেকাংশেই শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, আদিবাসী ও অন্ত্যজদের জীবনে তা বৃহৎ তাৎপর্য বহন করে আনেনি। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে ইংরেজ শাসকের দ্বারাই শুধু নয়, আদিবাসী ও অন্ত্যজরা ব্রিটিশযুগে স্বদেশি মহাজন, জমিদার ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক স্তরে ওপরে থাকা মানুষ দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেই ধারা অন্যরূপে একইভাবে প্রবাহিত। আইনে থাকা আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়, বনদপ্তর ও ঠিকাদারের যোগসাজসে সুরজের ঠাকুরদা মাটা গাগরাই দেখেছে আদিবাসীদের নামে ডাকা জঙ্গল ঠিকাদারের কাছে চলে যায়, আদিবাসী পায় হাঁড়িয়া খাবার দশ টাকা। অনেকক্ষেত্রে এমন নাম তালিকাভুক্ত করা হয়, যে নামে ওই অঞ্চলে কোনো আদিবাসী নেই। এভাবে

যুগ যুগ ধরে প্রবঞ্চনার পাহাড় জমতে থাকে। আদিবাসী ছেলেদের জন্য সুনির্দিষ্ট স্কুল ও হস্টেলে বর্ণহিন্দু ছাত্র রাখা হয়। খাওয়া ও থাকায় সচেতনভাবে বিভেদ রাখে কায়স্থ মাস্টার। সিমঝেরা পাহাড়ের শালবন কাটার ডাক দেয় রাওল সাহেব। কোলহন বা সিংভূম এলাকার আদিবাসীদের কাছে বিশেষত হো'দের কাছে এই সিমঝেরা পাহাড় ও তার নীচের শালবন ছিল অতি পবিত্র। মূলত শালগাছ তাদের কাছে ভগবানতুল্য। ফলে এই খবরে বাহাপরবের আগে আসন্ন বিপন্নতায় প্রায় পঁচিশটা গ্রামের মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করে কালু সুমরাই। অজ্ঞাত চেরো গ্রামের চাঁদ গাগরাইয়ের বেনামে জঙ্গল পাবার ডাক ওঠে। কালু সুমরাই রাওল সাহেবের এই পুরোনো ফন্দি ভেস্তে দিলে সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি হয় এবং মিলিত প্রতিবাদে রাওল সাহেব পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়। এরপরই কালু সুমরাই তৈরি করে ''কোলহন রক্ষাদল''। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বঞ্চনার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা বিভিন্ন বিষয়ে অধিকার ফিরে পেতে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে, আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। টাটানগরে খাদানে অধিকারের লড়াইয়ে একসময়ে কোলহান ক্রান্তিদলে নাম লিখিয়েছিল সুরজ গাগরাইয়ের বাবা। মরেছিল সেই লড়াই লড়তে গিয়েই। কালু সুমরাইয়ের সিমঝেরাকেন্দ্রিক প্রতিবাদে সফলতা এসেছে, প্রত্যাঘাতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে এসেছে কালু। কোলহন রক্ষাদল ভেঙে গেছে, যেমন ভেঙেছে কোলহন ক্রান্তি দল, কোলহন সেনা সংঘ। আর এই ব্যর্থতাগুলো, ভাঙা টুকরোগুলো একসময় ''অলগখণ্ড আন্দোলনে''র প্রস্তুতি নিয়েছে- ''কোলহানের সন্তানেরা অত্যাচারের নিষ্পেষণে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। আর এমনি করেই তাদের মধ্যে তৈরি হয় কয়েক বছর পরেকার অলগখণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রস্তুতি।''[১২৩] প্রসঙ্গত, মহাশ্বেতা দেবী টেনে এনেছেন ''সাগোয়ানা হঠাও'' আন্দোলনের প্রসঙ্গও। বনদপ্তর শালগাছ কেটে সেগুন গাছ লাগাতে শুরু করলে অসন্তোষ দানা বাঁধে আদিবাসীদের মধ্যে, কারণ সরকারের কাছে কিউবিক ফুটের হিসেবে

সেগুনের তুলনায় শালের দাম কম হলেও শাল আদিবাসীদের গরাম দেবতা, তাই ওদের বিশ্বাসে আঘাত নেমে আসে। শুধু তাই নয়, "শালের পাতা, ফুল, ফল, বীজ, ছাল ও কাঠ ওদের হাজার উপায়ে পেটের খিদে মিটায়। হাজার কাজে লাগে। বনভূমিতে শালের অবস্থান স্নেহশীল কর্তাব্যক্তির মতো। শালবনের মাটিতে লালিত ও পুষ্ট হয় নানান ঝোপড়া গাছ। লতা, আর কন্দে-মূলে-ফলে গরিবের খিদে মেটে।"[১২৪] ফলে, আদিবাসীদের কাছে শালগাছের মতো নিকট আত্মীয় সেগুন নয়। উপরন্তু সেগুন গাছ যে মাটিতে জন্মায় তাতে আর কোনও লতা বা ঝোপ হতে পারে না। ফলে, গড়ে ওঠে আন্দোলন, তৈরি হয় স্লোগান- "শাল আদিবাসী-/ সাগোয়ানা দিকু-/ সাগোয়ানা রোপাই-/বন্ধ করো।।"[১২৫] এই আন্দোলনকে অবলম্বন করে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন তাঁর *সাগোয়ানা* গল্প। এই গল্পে দেখা যায় ১৯৭৮ সালের ৬ই নভেম্বর সেগুন চারা রোপণের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র আদিবাসী প্রতিবাদে গুলি চালায় পুলিশ এবং মারা যায় বাণেশ্বর। এই আন্দোলন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে গতি দিয়েছিল এবং এইসময়ে আদিবাসীদের মধ্যে প্রবল শ্রেণিসচেতনতা গড়ে ওঠে। *সুরজ গাগরাই* উপন্যাসে ফৌজি হয়ে যাওয়া সুরজ এই সাগোয়ানা হঠাও লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করে কোলহানে সরকার মোতায়েন করে উত্তর বিহারের পুলিশ আর তাদের পাঠায় বিহারের অন্যত্র। কারণটা শ্রেণিসচেতন সুরজের কাছে স্পষ্ট- "এখন সুরজ বলে, নিয়মটা তো অনেক ভেবে বের করেছে। আমরা থাকলে কি আর গুলি চালাতাম আদিবাসীর উপরে?"[১২৬] সুরজ তার ফৌজি জীবনে বেশকিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, যার থেকে সে অনুভব করেছে সরকার ক্ষমতাসীন ধনীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারি আইনে খাদানে দশ-বারো বছরের বালকদের নামানো অপরাধ, বেআইনি চোদ্দ বছর বয়সের নীচে খাদানের কাজে কাউকে নিয়োগ করা, অথচ রমরমিয়ে চলে কিশোরদের খাদানের গহ্বরে নামানো। এক দুর্ঘটনায় সুরজরা দশ থেকে ষোল বছর বয়সি বাহাত্তরজনকে মৃত বা জীবিত অবস্থায় ধসে

যাওয়া খাদান থেকে উদ্ধার করে, অথচ সরকারি হিসেবে একষট্টি জন খাদানে ছিল। "আর্ত সাঁওতাল বালকগুলির মুখ সুরজের রক্তে গেঁথে যায় তিরের মতো।"[১২৭] এই উদ্ধার করতে গিয়ে পুনরায় ধসে মারা যায় সঙ্গী মোকাম ও জার্নেল সিং। ক্ষমতার কারবারি কোটি কোটি টাকার মালিক ব্যবসায়ী ঠিকাদাররা খাদানে নামায় বালকদের অবৈধভাবে, আর সরকারি ফৌজি দপ্তর নামায় সেনা- উভয়ে মারা পড়ে, অথচ এই ঠিকাদারদের শাস্তি হয় না। ক'দিন বন্ধ রেখে আবার খুলে যায় খাদান, আবার খাদানে নামে কিশোর বালকেরা। অব্যক্ত যন্ত্রণায় মানসিক রক্তক্ষরণ হয় সুরজের। এই ঘটনার পরপরই আরেকটি ঘটনা ঘটে সুরজের জীবনে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো "ডাকাত দমন" করতে গিয়ে সুরজ জানতে পারে খেতমজুরের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনকারী রাজ চৌহানকে সরকার "ডাকাত" তক্‌মা দিয়ে দেয়। সাধারণ বছর তিরিশের মৃত রাজ চৌহানের মৃতদেহ দেখতে দেখতে সুরজ সরকারি মিথ্যাচারকে অনুভব করে, দেখে শত শত স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধেরা নিতে এসেছে তাদের নিজের লোক রাজ চৌহানের দেহ, স্লোগানে স্লোগানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হাজারো রাজ চৌহান গড়ে তোলার আর বুকভর্তি ঘৃণায় তাদের কাছে খুনি হয়ে ওঠে সেনা- "শেষ অবধি অফিসার ট্রাকের ওপর উঠে দাঁড়ায়। হাতজোড় করে কী বলতে চায়। কিছুই সে বলতে পারে না। কেননা এখন শুধু স্কুলের ছাত্ররা আসতে থাকে। মৃতদেহগুলি ঘিরে ওরাও উত্তাল হয়। এখন গুলি চলে জনতার ওপর। আতঙ্ক, কোলাহল, ছুটোছুটি। সুরজ বোঝে যে ও নড়তেও পারবে না।"[১২৮] এই ঘটনার পর সেনার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সুরজ। আর তার ঠিক আগেই চেরো বাঁধ প্রকল্পের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় সরকার। সুবর্ণরেখা বহুমুখী বাঁধ প্রকল্পের মধ্যে চেরো বাঁধ প্রকল্পই ছিল সবচেয়ে বড়ো। এরফলে কোলহানের বহু আদিবাসী গ্রাম জলের নীচে তলিয়ে যাবে, লক্ষ লক্ষ আদিবাসী উদ্বাস্তু হবে। এই সিদ্ধান্ত সরকারি তরফ থেকে আদিবাসীদের জানানো হয় না, অথচ ১৮৩১-৩২

সালের কোল বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ১৮৩৭ সালের যে উইলকিনসন ব্যবস্থা তাতে সিংভূমের আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া, উইলকিনসন আদিবাসী মানকি বা পঞ্চায়েতদের হাতে শাসনের প্রভূত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাবও করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেই আদিবাসী জমি সরকারি প্রকল্পের জেরে ডুবে যাবে, লক্ষ লক্ষ আদিবাসী জমিহারা হবে, অথচ জমির বদলে জমির প্রদানের কোনও পরিকল্পনা থাকে না সরকারের। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রকের অফিসার শ্রীমতী পাঠক জানান, জমির বদলে জমি পাবে না আদিবাসীরা, পাবে টাকা। আর সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণে বাঁধা দিলে নামানো হবে পুলিশ ও সেনা। মহাশ্বেতা দেবী চূড়ান্ত অমানবিক সরকার আর লোভী কিছু সরকারি আমলা ও অফিসারের চিত্র আঁকলেন এই উপন্যাসে, যাদের কাছে এইধরনের বড়ো প্রকল্প অর্থ উপার্জনের অবৈধ উপায় এবং দেখালেন এই ধরনের প্রকল্পে আদিবাসীদের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষা করা হয় না, এমনকি রক্ষা করার কথা ভাবা পর্যন্ত হয় না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও এইভাবে জমির মালিক কৃষক আদিবাসীরা জমি হারিয়ে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয় ভূমিহারা মজুরে। খবরের কাগজে মোটা অক্ষরে উঠে আসে চেরো বাঁধ প্রকল্পের বাস্তবতা- "হর ক্ষেত কো পানি, হর হাঁথ কো কাম। দশ বছর ধরে কাজ চলবে। আগামী সাত-আট বছর ধরে প্রায় বিশ হাজার আদিবাসী স্থায়ী ও অস্থায়ী কাজ পাবে। রাজনগর, পোটকা, গামহারিয়া, চাইবাসা, সেরাইকেলা ও খুঁটপানি অঞ্চলে দুই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শো একর কৃষিক্ষেত্র জল পাবে। একুশ হাজার একর আদিবাসী জমি জলমগ্ন হবে। হর ক্ষেত কো পানি, হর হাঁথ কো কাম। কুড়িটি গ্রাম যাবে জলের নীচে, একচল্লিশটি গ্রাম হবে আধোডোবা। সব আদিবাসী গ্রাম।"[১২৯] সরকারি এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে তৈরি হয় ভিটেমাটি ও জমি হারানোর ভয় আর সেই ভয় থেকে গুমরে ওঠে অসন্তোষ। "অলগখণ্ডের আন্দোলন" তো চলছিলই, চেরো বাঁধ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতি। প্রেসিডেন্ট হয় চাঁদো পূর্তি এবং

সম্পাদক হয় সুরজ গাগরাই। এই সমিতি শান্তিপূর্ণভাবে লিখিত অভিযোগ ও আবেদন জানায় ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়, যে ঘোষণাপত্রে তারা অতীত ইতিহাস ও উইলকিনসন ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে সবাইকে। সমিতির কর্মসূচির আরেকটি ছিল বাঁধের স্থানে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থার যে প্রস্তুতি চলছে তা বন্ধ করে দেওয়া। সাইট ইঞ্জিনিয়াররা সাইটে কাজ তদারকি করতে অস্বীকার করে নিরাপত্তার দাবি তুলে। সরকার বাধ্য হয় আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে। আদিবাসীরা প্রশ্ন তোলে জমির বদলে জমি যদি সরকার না দেয়, তবে যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণবাবদ দেওয়া হবে তাতে গরিব আদিবাসীরা কোনো উর্বর জমি কিনতে পারবে না। ফলে, ভূমিহীন হয়ে পড়বে তারা। অন্যদিকে, বাঁধ তৈরির স্থানে যে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার অঙ্গীকার সরকার করছে তা মজুরের, অফিসের কোনো কাজে আদিবাসীদের নেওয়া হয় না। অর্থাৎ কৃষিজীবী মানুষগুলো পরিণত হবে ভূমিহীন মজুরে রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে। এই ভূমিহীন মজুর হতে অস্বীকার করে কোলহানের আদিবাসীরা। শুধু তাই নয়, বাস্তবে তারা বুঝেছে জমির বদলে ক্ষতিপূরণবাবদ যে টাকা পাওয়া যায়, তা জমির তুলনায় শুধু কম তাইই নয়, সেই টাকা আদিবাসীদের হাতে বেশিদিন থাকে না। *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন* (১৪০১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে দেখি ড্যামের জন্য উদ্বাস্তু হওয়া মানুষগুলো ১৯৫৫ সালে কুড়ি কাঠা জমির দাম পেয়েছিল ৩০০ টাকা। আর তারপর নাচে, গানে, মদে শেষ হয়েছে সেই টাকা। শুধু তাই নয়, ঔপন্যাসিক লিখলেন- "এমনও হয়েছে, সরল অশিক্ষিত সাঁওতালরা জমির ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে মনের আনন্দে একশ টাকার নোট নিয়ে মিহিজাম হাটে গেছে। টিনে ভরে কেরোসিন তেল কিনে যেই না দিয়েছে একশ টাকা, ডালডা তিওয়ারি তৎক্ষণাৎ তা পকেটস্থ করে খুচরো দু-পাঁচ টাকা ফেরত দিয়েছে। সহজ সরল

মানুষগুলো একশ টাকার পরিধি কতোটা, তা জানত না। ফলে প্রতিপদে ঠকতে ঠকতে একসময় শেষ হয়ে গেছে ক্ষতিপূরণের টাকা।"[১৩০]

এই উপন্যাসে উঠে আসে বিহারের দুটো অংশের মধ্যেকার সরকারি নীতিতে প্রভেদ এবং সেই বিভেদের মধ্যেই নিহিত থাকে "অলগখণ্ড" আন্দোলনের কারণ। ঔপন্যাসিক লিখছেন চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার কারণ- "কেননা বিহার শুধু উচ্চজাতি নিম্নজাতিতে বিভক্ত নয়, বিহার বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণ-পূর্ব বিহারকে নিঃস্ব করে তার রক্তপান করে বিহার রাজ্যে রাজকোষ স্ফিত হয়। নিয়ম। কেননা দক্ষিণ-পূর্বে থাকে কালো রঙের আদিবাসী, গরীব নিম্নবর্ণ, তারা মরুক, উচ্ছন্নে যাক্, তাদের রক্ত শুষে যে টাকা ওঠে জঙ্গল-খাদান-খনি থেকে, তার এক শতাংশও তাদের জন্য বরাদ্দ নয়।"[১৩১] কোলহান বা দক্ষিণ বিহারের আদিবাসী এলাকার প্রতি উত্তর বিহার বা রাজ্য সরকারের বঞ্চনা ও দীর্ঘদিনের বৈষম্য উত্তর-বিহারের প্রতি, রাজ্য সরকারের প্রতি কোলহানের মানুষদের বিতৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলেছিল। উত্তর-বিহারের লোক মানেই অত্যাচারী, আদিবাসীদের শত্রু- এমন ধারণাও গড়ে ওঠে, কারণ সুরজরা ছোটো থেকে দেখেছে তাদের ওপর অত্যাচারী ঠিকাদার-অফিসার-ইটভাঁটার মালিক-মহাজন-ব্যবসায়ীরা উত্তর বিহারের ও তাদের সাহায্য করা পুলিশ, প্রশাসনও উত্তর বিহারের। সুরজদের মনে হত- "উত্তর বিহারের লোকেরা চলে গেলেই কোলহানিদের কষ্ট ঘুচবে।"[১৩২] অথচ রাজ চৌহানের ঘটনার সময় সুরজ উপলব্ধি করে গরিব, বঞ্চিত, হতভাগ্য মানুষ উত্তর বিহারেও থাকে যাদের অধিকারের দাবিতে নামে রাজ চৌহানরা। বোঝে সব এলাকার গরিব ক্ষমতাহীনরা আসলে একসারিতে দাঁড়িয়ে, যারা কোলহানকে নিঃস্ব করে কোলহানের বুকের সম্পত্তিতে থাবা বসায় তারা উত্তর বিহারের ক্ষমতাশালী ধনী মানুষেরা, প্রশাসনও তাদেরই সঙ্গে, তাই কালু সুমরাই চেরো বাঁধ প্রসঙ্গে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলে– "জমিনের বদলে

জমিন। নয় তো কোলহান থেকে হাত ওঠাও। কে চায় তোমার বাঁধ-প্রকল্প। কে চায় তোমার জল? কে চায় শিল্প-কারখানা, নতুন নতুন শহর? অনেক শিল্প দেখেছে কোলহানের মানুষ, অনেক কারখানা অনেক শহর দেখেছে। ভারতের সকল রাজ্যের বড়লোককে আরো বড়োলোক করার দায় একা কোলহানের নয়। সিংভূমের বুক থেকে কোটি কোটি টাকার নাফা উঠাবে রাজ্য সরকার আর সিংভূমের লোক খাবে গুলি, এমন আর চলতে পারে না।"[১৩৩] ফলে, সরকারের সঙ্গে চেরো বাঁধ সংঘর্ষ সমিতির বিরোধ চরমে ওঠে। সেচবিভাগের তিনজন ইঞ্জিনিয়ারের ওপর আক্রমণ হয়, সমিতির সম্পাদক সুরজ গাগরাই সরকারি খাতায় "দেশদ্রোহী" বলে অভিযুক্ত হয়। "ওয়ান্টেড" সুরজের খোঁজ শুরু করে পুলিশ, নির্যাতন চলে সালাংগিবুরু গ্রামে। কোটাবুরু গ্রামে সুরজের বাড়িতে সুরজকে ধরতে যায় মফস্সল ও সদর থানা, রাজনগর ও মনঝরি থানার পুলিশ, দু'জন সি আর পি এফ ব্যাটালিয়ন, বিহার মিলিটারি ও জেলা সশস্ত্র পুলিশ। ঘরের দরজা খুলতেই উরুতে গুলি লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুরজ। গুলি ও তিরের সংঘর্ষ শুরু হয়, অবরোধ চলে। সুরজকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ডি. এস. পি. মাথুর। খবর আসে সুরজের মৃত্যু হয়েছে চাইবাসা সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই। সুরজের যে দেহটা চেরো গ্রামের মানুষেরা পায়, সেই দেহে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চিহ্ন দেখে তারা। ঔপন্যাসিক লেখেন– "এই সুরজের অক্ষিকোটরে চোখ দুটি উপড়ানো, বুকের ডানদিকে এক গভীর ক্ষত। কারো কথা শোনে না নান্দি, শবাচ্ছাদন নামিয়ে দেয় ও দু' চোখ ভরে সকলে দেখে নেয়।...দুই হাতের প্রতিটি গাঁট বিচূর্ণিত, পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ উপড়ানো, চামড়া টেনে ছেঁড়া গা থেকে।"[১৩৪] সুরজ ছিল খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষের নেতা গঙ্গারাম কালুন্ডিয়ার সাহিত্যিক নির্মাণ। গঙ্গারামকে নিষ্ঠুরভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যার কথা মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছিলেন এইভাবে- "সুরজ গাগরাই' সে সময়ের এবং ওই বাঁধ-সংঘর্ষ্-এর এক প্রকৃত দলিল। গঙ্গারামের হত্যা, ওর ছাই থেকে

উদ্ধারকরা পিতল, লোহার রড, গুলি ইত্যাদি ধাতব বস্তুর ওজন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, চাইবাসা থেকে আদিবাসীদের বাঙালি বন্ধুরাই আমাকে পৌঁছে দেয়।"[১৩৫]

স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের শ্রেণিচেতনার বা পৃথক সত্তাবোধের লড়াইয়ের নাম ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলন বা এই ধরনের আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাজাত কিনা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের গোড়ায় জল দিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যদিও মহাশ্বেতা দেবী বলেছিলেন- "ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মতে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। কেন তা বিচ্ছিন্নতাবাদী, এ কথার ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য দাবি করার উদ্দেশ্য হল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। কী থেকে বিচ্ছিন্ন, তা অবশ্য পরিষ্কার হয় না আমাদের কাছে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন করছেন যারা, তাঁরা বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য বা এক স্বয়ংশাসিত অঞ্চল চান। স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হলে কি সেটি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? স্বাধীনতার পর কি ভারতে পরের পর স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হয়নি? সেগুলি যদি না বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যই বা বিচ্ছিন্ন হবে কেন? ঝাড়খণ্ড রাজ্য যে শুধু আদিবাসীদের জন্য চাওয়া হচ্ছে, তাই বা এক কথায় মেনে নেব কী করে? ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সংক্রান্ত বৃহৎ জনসভায় বার বার বলা হয়, আদিবাসী–অ-আদিবাসী নির্বিশেষে সকল অত্যাচারিত মানুষের স্বার্থে এ আন্দোলন।"[১৩৬] ঝাড়খণ্ড নাম বা স্থানের চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে জানতে পারা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁর *শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যলীলার ১৭ পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গের বৃন্দাবনযাত্রা প্রসঙ্গে "ঝারিখণ্ড" স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। একস্থানে তিনি বলেন- "ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত। কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত।।"[১৩৭] মহাশ্বেতা দেবীর *সুরজ গাগরাই* নামক সত্যঘটনাভিত্তিক উপন্যাসের একস্থানে সুরজ বলেছে- "ভাই সব! আমরা সেই বীর কোলহা, যারা এক সময়ে

মোগলকে রুখেছে, এক সময়ে মারাঠাকে আর ছোটনাগপুরের রাজা দৃপনাথ শাহী, জগন্নাথ শাহী, সিংভূমের রাজা, খরসোঁয়ার ঠাকুর, বামনঘাটির মহাপাত্র, কাকে রোখে নি, কাকে হারায় নি? রোটাসগড় থেকে ওড়িশা সীমান্ত অবধি এই যে জঙ্গলদেশ, পুরানো সরকারি রেকর্ডে যাকে 'ঝাড়খণ্ড' বলছে, আমরা তো তারই সন্তান।"[১৩৮] মোঘল সময়ে ওড়িশা থেকে বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই বিস্তীর্ণ এলাকা ''ঝাড়খণ্ড'' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত ঝাড় বা জঙ্গলময় স্থান বলে এই নামকরণ ঘটে। H. Coupland (I.C.S) *Bengal District Gazetteers : Manbhum*-এ লিখছেন "To the Muhammadan historians the whole of the Chota Nagpur and the adjoining hill states was known by the name of Jharkhand;"[১৩৯] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ছোটোনাগপুরের এই অংশ বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের চরমতা বিহারকে উত্তর ও দক্ষিণে যে ভাগ করে দিয়েছিল, তা মহাশ্বেতা দেবীর *সুরজ গাগরাই* উপন্যাসে অংশত প্রতিফলিত। ফলে, জাতিসত্তার নিরিখে ''ঝাড়খণ্ড'' রাজ্যের দাবিতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন দানা বাঁধে। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত মূলত ১৯৪৯ সালে ঝাড়খণ্ড পার্টির হাত ধরে। ওই বছর জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে আদিবাসী মহাসভা থেকে এই ঝাড়খণ্ড পার্টির জন্ম হয়। জয়পাল সিং জানাচ্ছেন, "The Chota Nagpur Unnati Sammaj (Chota Nagpur Improvement Society) founded in 1920, which was succeeded by Adibasi Mahasabha in 1938, opened many gains *golas* in the District of Ranchi, which are still there floursing."[১৪০] ১৯৫২ সালে ঝাড়খণ্ডের দাবি নিয়ে বিহারের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ঝাড়খণ্ড পার্ট। ১৯৬৩ সালে ঝাড়খণ্ড পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়। ১৯৭০ সাল নাগাদ সারা ভারত ঝাড়খণ্ড পার্টি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার হাত ধরে এই

আন্দোলন গতি পায়। শেষপর্যন্ত ২০০০ সালের ১৫ই নভেম্বর দেশের ২৮তম রাজ্য হিসেবে ঝাড়খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। A. K. Roy ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কারণ তুলে ধরতে গিয়ে "Internal Colonialism"তত্ত্ব টেনে এনেছেন, যেখানে জাত-পাতের বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবস্থাকে এর উপাদান হিসেবে ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন। এই অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার আভাস মহাশ্বেতা দেবীর *সুরজ গাগরাই*তে ছড়িয়ে রেখেছেন, যেখানে আদিবাসী অধ্যুষিত দক্ষিণ বিহারের খনিজ সম্পদের ব্যবহারে লাভবান হয় উত্তর বিহার, দক্ষিণ বিহারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলে উত্তর বিহারের উন্নয়ন। A. K. Roy বলছেন- "To understand the Jharkhand Movement properly we must understand how uneven development of the area or the different segments of the society is creating problem of the internal colonialism in the model of South Africa, where the exploiters and the exploited are not connected with any social link though staying within the same geographical area. ...In India, the under-developed area is exploited by the developed areas as colonies, as are the underdeveloped by the developed people... This is the real two-nation theory operating in India."[১৪১] ঝাড়খণ্ডের মানুষের অবস্থা বোঝাতে এবং সেই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অবস্থান বোঝাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন- "It is interesting feature of Indian body politic that those who are socially exploited are economically exploited also and they live in the exploited and backward area called Jharkhand."[১৪২] ফলে, ঝাড়খণ্ডের দাবি এই দীর্ঘকালীন শোষণ থেকে মুক্তি ও এই এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ রূপে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছিল। মানব চক্রবর্তীর *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন* (১৪০১বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে

মানব-মানবীর ভালোবাসার স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের আবহে। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে লিখছেন- "সেইসব যুবক-যুবতীকে, সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের প্রবাহিত রক্তধারা যাদের দেহে, বুকে যাদের 'তিল্‌কা'-র জ্বেলে যাওয়া আগুন, চোখে 'বিরসা'-র স্বপ্ন, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও স্বধিকার অর্জনের লড়াইয়ে আজও আপোষহীন, ইস্পাতকঠিন..."[১৪৩] উপন্যাসের সময়কাল স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছর পরের অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল নাগাদ। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও সিংদোয়ারি, লোহাপাড়া, চন্দ্রটিপা প্রভৃতি গ্রামে খাবার জল নেই, চাষের জমি নেই, বিদ্যুৎ নেই। এলাকার অধিকাংশ লোক ভিটামিনের অভাবজনিত অসুখে ভোগে। স্বাধীনতার পর যা কিছু উন্নয়ন, ড্যাম নির্মাণ তা তাদের জমি আত্মসাৎ করেছে, দেয়নি কিছুই। পাহাড়ের পাথর চলে গেছে শহরে, ড্যামের ফলে আলোয় মুড়েছে শহর, আর আলোর তলার অন্ধকারের মতো এই আদিবাসী মানুষগুলো জমি হারিয়ে তলিয়ে গেছে অন্ধকারে- আর সে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সরকারের। তুতুরির মনে হয়- "মনে লেয়, ই দ্যাশটো বুঝি আমাদের লয়। আমরা কুথা থেইকে আইসলম, কুথা যেছি, কিছুই মালুম নাই। জনমভর শুধু ইয়ার পিছে ঘুইরলম, উয়ার পিছে ঘুইরলম। আমার বাপে ঘুইরলেক, তার বাপে ঘুইরলেক। ঘুইরতে-ঘুইরতে থইকে গেলম, কিন্তু বুইঝতে লাইরলম কেনে আন্ধারে–কান্ধারে খুদকুঁড়া খেইয়ে আমাদের রইতে হবেক! কেনে চাষের জল ইঠেনে আইসবেক নাই!"[১৪৪] "বদলা ফাউন্ডেশন" বিহারের সাঁওতাল পরগণায় জনহিতকর কাজ করে। ক্যাওটজালির বদলা ফাউন্ডেশনের গান্ধী আশ্রমের মূল দায়িত্বে বীণা সরকার। এই সব দরিদ্র গ্রামগুলোর মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, খাদি থান তৈরি করে তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, পালনের জন্য ছাগল দেওয়া, শাল-শিশু গাছের চারা দেওয়া ইত্যাদি এই ফাউন্ডেশন করে এবং তুতুরি ও দাদার আপত্তি সত্ত্বেও বিটিয়া এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিটিয়া আর তুতুরি পরস্পরকে ভালোবাসে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সঙ্গে

যুক্ত না হওয়া, বদলা ফাউন্ডেশনের হয়ে কাজ করা, সাঁওতালি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারের বিরোধিতা করায় তুতুরি আগেই সাঁওতাল সমাজের প্রধানদের কুনজরে পড়ে, বিটিয়াকে দাদার হাত থেকে রক্ষা করে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সাঁওতাল সমাজ একই পারিশ বা গোত্রের মেয়েকে ভালোবাসার অপরাধে তুতুরির বিরুদ্ধে ‘‘বিটলাহা’’র সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ সমাজচ্যুত করে। শাস্তিস্বরূপ পুড়িয়ে দেয় তুতুরির বাড়ি। পুড়ে মারা যায় তুতুরির বাবা। তুতুরিকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক এই আন্দোলনজনিত সাধারণ আদিবাসী মানুষের অবস্থান, তাদের বাস্তব অবস্থা এবং তুতুরির দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন। মাটি ও মানুষের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তুতুরি। ঝাড়খণ্ডের দাবি না করা ব্যক্তিকে ঝাড়খণ্ডের সমর্থনকারীরা শত্রু ভাবে। বদলা ফাউন্ডেশন মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, খাবারের ব্যবস্থা করে, তুতুরির মনে হয় সীমানা ঘেরা নিজেদের রাজ্য হলেই কি পেট ভরা ভাত, জমিতে চাষের জল, পরনের কাপড়, বাচ্চাদের পড়াশোনা হবে? কারা করবে? কাদের হাতে যাবে এই ক্ষমতা? কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, স্ত্রী-কন্যার সম্মান রাখতে অপারক নেশাগ্রস্ত সাঁওতাল সমাজ দেশ নিয়ে কি করবে? তুতুরির এইসব প্রশ্নের, ভাবনার অন্তরালে নিহিত থাকে সেই কঠিন সত্যটা, এই সীমানা দিয়ে ঘেরা পৃথক রাজ্যের ক্ষমতা ভোগ করবে আদতে কারা, অন্ধকারে নিমজ্জিত সাঁওতাল জীবন, সমাজ, সংসার কতটা লাভবান হবে। এরসঙ্গে লেখক যুক্ত করে দেন এই প্রশ্নটাও কেন গোটা দেশটাই তাদের দেশে- এমন পরিস্থিতি তৈরি করা গেল না। অন্যদিকে, পলাশীর নিজের জমি পাওয়ার দাবিকেও তুতুরি একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। সে জমি যে সরকার দেয় না, সাঁওতাল মানুষের কষ্টের কথা বোঝে না, তাকে নাড়াতে গেলে, জমি পেতে গেলে রাজনৈতিক জোর লাগে- “যে সমস্যা মাটির লেইগ্যা, উয়ার লেইগ্যা পাট্টি চাই। মার খেঁইয়ে পলাই যাবার পাট্টি লয়, উল্টা মার দিবার পাট্টি। দাঁতে-দাঁত কইষ্যে জান বাজি রাইখবার পাট্টি...।”[১৪৫] লেখক এই উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন নিয়ে কোনো বিশিষ্ট মত

বা বক্তব্যকে পরিবেশন করেননি, বিভিন্ন মানুষের মুখ দিয়ে তিনি আশা আর আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন। বিনয় বেসরা শুনিয়েছেন সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নেমে আসার হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনের কথা। দেখিয়েছেন, যারা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি করছে তারাও সাঁওতালি সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রতি উদাসীন থাকছে- "ওরা পরোয়া করে শুধু জনসমর্থনের। জনসমর্থন থাকলেই একটা নির্দিষ্ট জাতির ঐতিহ্যময় অতীতের পুনরুত্থান ঘটে না। হ্যাঁ, চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায় মাত্র। এ বড় আশংকার কথা। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে কোনও জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন আজ অবধি দিশা পায়নি। সফলতা তো অনেক দূরে।"[১৪৬] ক্ষুদিরাম সেনগুপ্তের গলায় পরিষ্কারভাবে শুনিয়েছেন নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন না হয়ে, রাজ্য চালানোর যোগ্যতা অর্জন না করে এই লড়াই মুক্তির পথ দেখাবে না। মানুষকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হয়, দীর্ঘদিনের সেই প্রস্তুতি। অজস্র কুসংস্কারের ওপর বসে মানুষের উন্নতি করা যায় না- "শত্রু চিনতে হলে আগে নিজেকে জানতে হয়, চিনতে হয়। নিজেকে তৈরী করতে হয়। এখনও অজস্র গ্রামে ডান্, ওঝা, জানগুরু, মাঝি হাড়াম, জগ-মাঝি, নায়েকে, এরাই সর্বেসর্বা।"[১৪৭] এই বক্তব্যের সমর্থনেই তুতুরির সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের ঘৃণ্য রাজনীতি ঘটে। সমাজ পুড়িয়ে দেয় ঘর, সেই আগুনে পুড়ে যায় তুতুরির বাবা পিয়ল। আশ্রমও সেই আগুন নেভাতে পারে না। উপন্যাস শেষ হয় কোনো তত্ত্ব বা আন্দোলনের রূপরেখায় বা তার প্রত্যাখ্যানে নয়, ব্যক্তিমানুষের স্বজন হারানোর যন্ত্রণা ও আর্তনাদে।

আদিবাসী আন্দোলনের ইতিহাসের সাহিত্যিক নির্মাণে চোট্টির কাহিনি স্থান না পেলেও, মুণ্ডা জীবনে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা হয়ে বিরসা-পরবর্তী সময়েও যে মুণ্ডাদের ওপর শোষণ কমেনি, সেই বাস্তবতার সাহিত্যিক নির্মাণ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত মহাকাব্যোপম

উপন্যাস *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির* (১৯৮০)। এই উপন্যাসে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের উত্তরাধিকারকে সাহিত্যিক প্রবাহিত করেছেন বিরসা থেকে চোট্টি পর্যন্ত। মধ্যিখানে সংযোগ রক্ষা করেছে ধানী মুণ্ডা। উপন্যাসের শেষে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তোলিত হাজার ধনুক আসলে সেই বিদ্রোহের উত্তরাধিকার, যা প্রতিটা আদিম অধিবাসীর ও শোষিতের বুকে, হাতে, রক্তে প্রবাহিত হোক চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। চোট্টিকে তাই মিথ করে চিরন্তন করে তুলেছিলেন। ভারতীয় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জনমানসে ইংরেজ বিরোধিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভবের আগেই ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্পর্ধা দেখিয়েছিল ভারতীয় কৃষক সমাজ। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালে শুরু হওয়া "সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ"ই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ।[১৪৮] পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত কৃষক বিদ্রোহের মূলসুরই ছিল জমিদার, মহাজন ও বিদেশি শাসন থেকে ভূমিস্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি। আদিবাসী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ যে লক্ষ্যে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, তাও জমিকেন্দ্রিক অধিকার ও শোষণের বিরুদ্ধেই। আদিবাসী আন্দোলনের আরেকটা দিক অবশ্যই ছিল জঙ্গল বা অরণ্যের ওপর অধিকার, যা তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বেও বৈষম্যজমিত বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্য তারা প্রতিবাদের পথে হেঁটেছিল। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার লড়াইও ছিল এই দীর্ঘদিনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটা পদক্ষেপ। এভাবে জাতিসত্তার প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি প্রাসঙ্গিক কিনা, উচিত কিনা- সে নিয়ে মতবিরোধ ছিল, থাকবে। শুধু তাই নয়, আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ড তাদের শোষণমুক্ত করে তুলতে পারবে কিনা বা পেরেছে কিনা-তা নিয়েও সংশয় আছে। তবু মহাশ্বেতা দেবী ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে বঞ্চনা ও শোষণ

আদিবাসী জীবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, অথচ প্রত্যাঘাতে তারা বিদ্রোহ করলে তাকে "হাঙ্গামা" বলে ইতিহাসে যে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে, তাকে আঘাত করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *অরণ্যবহ্নিতে*, কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষিত মানসকে আঘাতে জর্জরিত করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। ঔপন্যাসিকরা সেই একপেশে ইতিহাসের পাশে এক বিকল্প ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন, যেখানে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে আদিবাসীদের ওপর শোষণ ও রক্তমাংসের মানুষের প্রতিরোধের স্বরূপ তুলে আনা হয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে এই অধ্যায়ে সেই স্বরূপকে বোঝার চেষ্টা করা হল।

তথ্যসূত্র :

১। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* ডি এন বি এ ব্রাদার্স, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১০

২। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩ ,পৃষ্ঠা- ১১

৩। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪১৮

৪। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪২৮

৫। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৩৪

৬। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৩৮

৭। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৪৩

৮। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ৯

৯। মহাশ্বেতা দেবী, "শালগিরার ডাকে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৫০

১০। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ১১-১২

১১। W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, West Bengal District Gazetters, Government of West Bengal, Calcutta 1996, p- 153

১২। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 3

১৩। W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, West Bengal District Gazetters, Government of West Bengal, Calcutta 1996, p- 161

১৪। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 3

১৫। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩ , পৃষ্ঠা- ৯০

১৬। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮৭

১৭। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩ , পৃষ্ঠা- ৯৮

১৮। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩ , পৃষ্ঠা- ৮০

১৯। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 5-6

২০। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* ডি এন বি এ ব্রাদার্স, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৩১৭

২১। অরুণ চৌধুরী, *সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয় সংগ্রাম,* ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১০১-১০২

২২। দিগম্বর চক্রবর্তী, "১৮৫৫-র সাঁওতাল হুলের ইতিহাস," *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৪০২, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা- ৯

২৩। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 14

২৪। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৯০

২৫। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 14-15

২৬। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৯৫

২৭। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৯৬

২৮। Kalikinkar Datta, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Gyan Publishing House, New Delhi, Indian Reprint 2017, p- 15-16

২৯। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২৬

৩০। বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৯৯

৩১। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৯২

৩২। W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Calcutta 1996, p- 164-165

৩৩। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৯৯

৩৪। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১০৪

৩৫। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২৪

৩৬। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১১০

৩৭। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২২

৩৮। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২৩

৩৯। W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Calcutta, 1996, p- 382

৪০। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১২৬

৪১। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ১০৪

৪২। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ১০৪

৪৩। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৩৯

৪৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "অরণ্যবহ্নি", *তারাশঙ্কর-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড,* গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ২৮৭

৪৫। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ভূমিকা অংশ

৪৬। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 6

৪৭। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৩৩

৪৮। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 36

৪৯। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 37

৫০। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 20

৫১। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 21

৫২। মহাশ্বেতা দেবী, "হুলমাহা", *মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩ পৃষ্ঠা- ৮১

৫৩। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৪১

৫৪। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৪৩

৫৫। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 38

৫৬। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 38-39

৫৭। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 39

৫৮। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৫৮

৫৯। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 40

৬০। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 40

৬১। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৭০

৬২। মহাশ্বেতা দেবী, "অরণ্যের অধিকার এবং...",*অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৮

৬৩। মহাশ্বেতা দেবী, "অরণ্যের অধিকার এবং...",*অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৪

৬৪। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১২৭

৬৫। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৪৮

৬৬। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 59

৬৭। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৯৮

৬৮। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, "অরণ্যের অধিকার এবং চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ : একটি তুলনামূলক আলোচনা", *মহাশ্বেতা নানা বর্ণে ও নানা রঙে*, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ই মে, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১২৯

৬৯। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 82-83

৭০। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৫৮

৭১। K. S. Singh, *Birsa Munda and his Movement 1874-1901,* Oxford University Press, 1983, p- 101

৭২। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৭৩

৭৩। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ২৭

৭৪। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৯৩

৭৫। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৯৩

৭৬। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১২৭-১২৮

৭৭। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১১৮

৭৮। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১৪৯

৭৯। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ২১৬

৮০। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮ পৃষ্ঠা- ২২৭

৮১। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১২

৮২। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮ পৃষ্ঠা- ২২

৮৩। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮ পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৮

৮৪। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮ পৃষ্ঠা- ১১

৮৫। হরিভূষণ পাল, *'৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি,* সৈকত, আগরতলা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪৩-৪৪

৮৬। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২০

৮৭। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৯

৮৮। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১০

৮৯। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৫৬

৯০। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৮৭

৯১। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১০৩

৯২। হরিভূষণ পাল, *'৪৩-এর রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণি,* সৈকত, আগরতলা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪২

৯৩। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১১৮

৯৪। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৭

৯৫। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১১

৯৬। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১৭৯

৯৭। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৩৬

৯৮। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৪৮

৯৯। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২০৯

১০০। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, *বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি,* তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৬৬

১০১। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২২৬

১০২। শক্তিপদ রাজগুরু, *রতনমণি, রিয়াং,* পূর্বাচল, কলকাতা, মে ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ২২৪

১০৩। সুপ্রকাশ রায়, *বিদ্রোহী ভারত (১৭৬৩-১৯৮২),* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২৫৪

১০৪। সুপ্রকাশ রায়, *বিদ্রোহী ভারত (১৭৬৩-১৯৮২),* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২০৪

১০৫। গুরুপ্রসাদ কর, ''নকশালবাড়ির সংগ্রামের আলোকে উঠে আসা ভারতীয় সমাজের চরিত্রায়ন কী আজও প্রাসঙ্গিক?'', *নকশাল বাড়ি ৫০ : স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ*, সুমন কল্যাণ মৌলিক সম্পাদিত, রূপালী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৬২

১০৬। চিত্তরঞ্জন দাশ, *পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি,* এম এল আর সি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৪

১০৭। শৈবাল মিত্র, *ষাটের ছাত্র আন্দোলন,* আজকাল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬০

১০৮। অসীম চট্টোপাধ্যায়, ''ষাট দশকের যুব-ছাত্র আন্দোলন'', *সত্তর দশক, তৃতীয় খণ্ড,* অনিল আচার্য সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা- ২১

১০৯। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৯

১১০। দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, ''ছাত্র-আন্দোলন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ'', *সত্তর দশক, তৃতীয় খণ্ড,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৫৪

১১১। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৮৯

১১২। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৯৮

১১৩। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১০১

১১৪। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১০৬

১১৫। স্বর্ণ মিত্র, *গ্রামে চলো,* ল্যাম্পপোস্ট, ঢাকা, ল্যাম্পপোস্ট প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১২০

১১৬। জয়ন্ত জোয়ারদার, *এভাবেই এগোয়,* বুক মার্ক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৯

১১৭। সৌরেন বসু, ''ছিন্নবন্ধন প্রমিথিউস'', *জঙ্গল সাঁওতাল,* আশিস মৈত্র ও রঞ্জন সেন সম্পাদিত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭

১১৮। কানু সান্যাল, ''সুদীর্ঘ সংগ্রামের একটি উৎকৃষ্ট ফসল : জঙ্গল'', *জঙ্গল সাঁওতাল,* আশিস মৈত্র ও রঞ্জন সেন সম্পাদিত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪

১১৯। গুণময় মান্না, *শালবনি,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ১৯০

১২০। সমরেশ বসু, *মহাকালের রথের ঘোড়া,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ২২

১২১। সমরেশ বসু, *মহাকালের রথের ঘোড়া,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, সপ্তম মুদ্রণ, মার্চ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৮৬

১২২। মহাশ্বেতা দেবী, ''ভূমিকার পরিবর্তে'', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১০

১২৩। মহাশ্বেতা দেবী, ''সুরজ গাগরাই'', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬২

১২৪। মহাশ্বেতা দেবী, ''সুরজ গাগরাই'', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬৬

১২৫। মহাশ্বেতা দেবী, ''সুরজ গাগরাই'', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬৭

১২৬। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬৭

১২৭। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬৮

১২৮। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৭০

১২৯। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮২

১৩০। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃষ্ঠা- ৩৪

১৩১। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮৪

১৩২। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৬৯

১৩৩। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮০

১৩৪। মহাশ্বেতা দেবী, "সুরজ গাগরাই", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২০৭

১৩৫। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১০

১৩৬। মহাশ্বেতা দেবী, "ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ও বিচ্ছিন্নতাবাদ", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র একাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫২২

১৩৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১৯৬

১৩৮। মহাশ্বেতা দেবী, "ভূমিকার পরিবর্তে", *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র দ্বাদশ খণ্ড,* অজয় গুপ্ত সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮৪

১৩৯। H. Coupland, *Bengal District Gazetteers : Manbhum*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911, p- 52

১৪০। Jaipal Singh, "Jai Jharkhand! Jai Adivasi! Jai Hind", *The Jharkhand Movement,* R. D. Munda, S. Bose Mullick edited, IWGIA (Document No 108), Copenhagen, 2003, p- 9

১৪১। A. K. Roy, "Jharkhand : Internal Colonialism", *The Jharkhand Movement*, R. D. Munda, S. Bose Mullick edited, IWGIA (Document No 108), Copenhagen, 2003, p- 81

১৪২। A. K. Roy, "Jharkhand : Internal Colonialism", *The Jharkhand Movement*, R. D. Munda, S. Bose Mullick edited, IWGIA (Document No 108), Copenhagen, 2003, p- 80

১৪৩। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, উৎসর্গ অংশ

১৪৪। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃষ্ঠা- ৯

১৪৫। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃষ্ঠা- ১২৫

১৪৬। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃষ্ঠা- ৯৪

১৪৭। মানব চক্রবর্তী, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃষ্ঠা- ১৪০

১৪৮। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* ডি এন বি এ ব্রাদার্স, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ২০